প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ

অবন্তীকুমার সান্যাল

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-১২

মুদ্রাকর

শ্রীঅবনীমোহন রায়

তারকনাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১২ বিনোদ সাহা লেন,

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

চারু খান

"সর্বশাস্ত্ররসমজ্জনশুভ্রচিত্ত"
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
শ্রীচরণেষু ।

এই লেখকের :

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি

অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য

নিবেদন

'পরিচয়,' 'মাসিক বসুমতী', নতুন সাহিত্য', 'এক্ষণ', 'মৈত্রী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এগারোটি প্রবন্ধ একত্রে 'প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। প্রথম প্রবন্ধটির রচনাকাল কার্তিক, ১৩৫৮ সাল, সর্বশেষেরটির আশ্বিন, ১৩৫৮ সাল। 'গ্রীক ট্রাজিডির বিবর্তন' প্রবন্ধটি ছাড়া কোনো প্রবন্ধেই কোনো পরিবর্তন করা হয় নি। তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধকে একটি প্রবন্ধে রূপান্তরিত করতে গিয়ে এটিতে কিছু অনুচ্ছেদ বাদ দিতে হয়েছে। গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় প্রয়োজনবোধে কিছু 'নির্দেশিকা' ও 'টীকা' জুড়তে হয়েছে। সর্বশেষ প্রবন্ধটির বিস্তারিত 'টীকা' মূল রচনার অঙ্গীভূত।

বিভিন্ন সময়ের লেখা বলে প্রবন্ধগুলিতে সতর্ক পাঠকের চোখে ভাষার কিঞ্চিৎ অসমতা, কতিপয় বানানের নিয়মশৈথিল্য ধরা পড়বে। গ্রীক ও লাতিন নামগুলির উচ্চারণ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। নামগুলি যতদূর সম্ভব মূল ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী হওয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু যেহেতু আমরা সাধারণভাবে ইংরেজি উচ্চারণের সঙ্গে অতি পরিচিত, সেইহেতু মূলানুগ করতে গিয়ে প্লেটোকে 'প্লাতোন' বা ইস্কাইলাসকে 'অয়স্‌খুলোস' বলা চলবে না। মূলানুগ উচ্চারণ করতে গিয়ে বাংলার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে, ঠিক যেমনটি রেখেছিলেন গ্রীকজানা মাইকেল তাঁর 'হেক্‌টরবধে'। মাইকেলের মতো নিক্তিতে ওজন করে উচ্চারণ নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা কজনের থাকে? হালের রচনা হলে কিছু নামের উচ্চারণ অবশ্যই কিঞ্চিৎ পৃথক হতো, কিন্তু মুদ্রিত রচনাগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই কোনো পরিবর্তন করি নি।

কিছু কিছু মুদ্রণ ত্রুটি আছে, উল্লেখ না করলেও, পাঠক সেগুলি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। তবুও একটি ত্রুটির সলজ্জ উল্লেখ না করে পারি না। ৩১ পৃষ্ঠার 'নির্দেশিকা'য় মারি রেনোর বইটির নাম হবে 'দি কিং মাস্ট ডাই'। এই ত্রুটির জন্য দায়ী লেখকের অমার্জনীয় অন্যমনস্কতা।

এই গ্রন্থের মূলে আছেন আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপিকা বিজয়া চক্রবর্তী, পত্রপত্রিকার আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে বেশির ভাগ প্রবন্ধ উদ্ধার করে যিনি বহুদিন আগে সযত্নে অনুলিপি করে রেখেছিলেন। গ্রন্থপ্রকাশের প্রেরণা আমার কন্যা শ্যামলী সান্যালের আগ্রহাতি শয্যা। গ্রন্থের নামকরণ করেছেন এবং নির্দেশিকা-টীকা সংযোজনের নির্দেশ দিয়েছেন বন্ধুবর ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। আর গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে করুণা প্রকাশনীর আনুকূল্যে।

বৈশাখ, ১৩৬৭ — অবন্তীকুমার সান্যাল

সূচীপত্র

জাদু ও শিল্পকলা

....

পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন যে, আদিযুগে মানুষ যূথবদ্ধ হয়ে গাছের ডালে দিন কাটিয়েছে। তার ফলেই বিচিত্র কর্মশক্তি লাভ করেছে তার হাত। পরে যে কারণেই হোক না কেন, যেদিন গাছ ছেড়ে দুপায়ে ভর দিয়ে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে শিখেছে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তার অগ্রগতি। মানুষ জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে দুটো জিনিস আয়ত্ত করে—একটি অস্ত্র (tool), অপরটি তার বাক্-ক্ষমতা। মানুষের সমগোত্রীয় জীবেরা হাতের ব্যবহারে যতই চমৎকৃত করতে পারুক না কেন, হাত দিয়ে অস্ত্র তৈরি করবার ক্ষমতা তাদের কারুর নেই। একমাত্র মানুষই অস্ত্র তৈরি করে ব্যবহার করতে পারে। আর বাক্-ক্ষমতার বেলাতে দেখা যায় যে, জীবের বাক্-যন্ত্র অসম্পূর্ণ, সবরকম মনোভাব প্রকাশে সে অসমর্থ। একমাত্র মানুষই তার মনের ভাব বিশদভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম।

জীবজগৎ থেকে অস্ত্রধারী মানুষ যেদিন পৃথক হয়েছে, সেদিন সব চেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের। মানুষ ছাড়া আর সবাই প্রকৃতির অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্দী। প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে মানুষ অস্ত্র হাতে বেরিয়েছে তাকে জয় করতে। প্রকৃতির দানে সন্তুষ্ট না হয়ে মাটি খুঁড়েছে, ফসল বুনেছে, বন্য জন্তুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছে, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করতে শিখেছে। অস্ত্রকে সে কাজে লাগিয়েছে প্রকৃতি জয়ের উদ্দেশ্যে। আর এমনি করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে প্রকৃতির নিয়মকানুন সম্পর্কে, যেমন, বৃষ্টি হলে ফসল ফলে, অনাবৃষ্টিতে ফসল

ধরে। সেই সঙ্গে বুঝতে শিখেছে এই সত্যটি যে, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের সঙ্গে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো যোগ নেই: প্রকৃতি স্বাধীন, সম্পূর্ণভাবে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বাসনা-কামনার ঊর্ধ্বে। প্রকৃতির ঘটনাবলী লক্ষ্য করে একটু একটু করে মানুষ বুঝতে শিখেছে কার্যকারণের রহস্য। আর তাই, কারণ জেনে কার্য ঘটানোও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

মানুষ চেয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনগুলি আয়ত্ত করে নিজের কাজে লাগাতে। কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে সে প্রকৃতির রহস্য বুঝে উঠতে পারে নি, সেই সেই ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনের ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে কল্পনায় আয়ত্তে আনতে চেয়েছে। আজকের দিনে আশ্চর্য মনে হলেও, আদিম মানুষের কাছে তার এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ব্যাপারটা খুবই বড় কথা ছিল। প্রকৃতির বাধাকে জয় করে নিজেকে টিকিয়ে রাখার প্রেরণাই আত্মপ্রকাশ করেছিল এর মধ্য দিয়ে। এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের চেষ্টা থেকেই জাদুর (magic) উৎপত্তি।

বাস্তবের যেখানে অভাব, মায়ার (illusion) সাহায্যে সেখানে সেই অভাব পূরণের চেষ্টাকে সোজাকথায় জাদু বলা যেতে পারে। জাদু হচ্ছে অভিপ্রেত বাস্তবের মানস-প্রক্ষেপ। বাস্তব পরিবেশের উপর আরোপিত পরিবর্তনের ইচ্ছাই জাদুর মধ্যে প্রতিফলিত। প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে অ-সভ্য (savage) দরিদ্র মানুষের পরিবেশ পরিবর্তনের এই ইচ্ছাই ছিল তার জীবনধারণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এই ইচ্ছাশক্তির বস্তুগত (objective) ও আত্মগত (subjective) সামগ্রিক প্রকাশ জাদুর মধ্যে। অ-সভ্য মানুষের কাছে তাই প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার উপায় হচ্ছে জাদু ; জাদুর সাহায্যে নিজের ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে অভিপ্রেত সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করাই তার মনোগত কামনা।

জাদুর অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের বাস্তব রূপটি কী ? অ-সভ্য মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় কামনা শিকার প্রাপ্তির কথাই ধরা যাক।

সে চায় অনিশ্চিত শিকারকে আয়ত্তে আনতে। কিন্তু বাস্তব শিকারের সঙ্গে অ-সভ্য মানুষের শিকারকে আয়ত্ত করার মনোগত ইচ্ছার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এ ক্ষেত্রে তার শিকার আয়ত্ত করার দুর্দমনীয় ইচ্ছা রূপ পায় নানা ভাবে। প্রথমত, শিকার সম্পর্কিত মনোগত ইচ্ছার শব্দগত প্রকাশে ; দ্বিতীয়ত, অভিপ্রেত অথচ অনুপস্থিত শিকার ও তাকে আয়ত্ত করার বাস্তব প্রক্রিয়ার অনুকৃতিতে। প্রথমটি, জাদুর মন্ত্র (spell)—সুসংবদ্ধ শব্দাকারে গ্রথিত অভিপ্রেত বস্তু-সম্পর্কিত বক্তব্য ; দ্বিতীয়টি, অনুষ্ঠান (rite)—মন্ত্রের বক্তব্যকে অনুকৃতির মাধ্যমে রূপায়িত করার চেষ্টা। জাদুক্রিয়ায় মন্ত্র ও অনুষ্ঠান অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।

অ-সভ্য মানুষ যদি বৃষ্টি চায়, তাহলে মন্ত্রোচ্চারণ করবে বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশে, সে মন্ত্রে থাকবে বৃষ্টির দেবতার মহিমা, তার বাস্তব বর্ণনা ; আর তার সঙ্গে অনুকৃতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবে মেঘের গর্জন, জলের বর্ষণ। এরই নাম জাদু-অনুষ্ঠান। অভিপ্রেত বাস্তবকে আয়ত্ত করার প্রেরণা থেকেই এর সৃষ্টি। আর কায়িক ও বাচিক ভঙ্গি ও অনুকৃতি জাদু-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ; কারণ, মায়া (illusion) সৃষ্টির জন্য এগুলি অপরিহার্য। এই জাদু-অনুষ্ঠানেরই প্রকারভেদ অনুকার নৃত্য (mimetic dance)।

অ-সভ্য মানুষেরা শিকারের আগে নৃত্য করে। এই নৃত্যে ধারা-বাহিকভাবে শিকারের যাবতীয় দৃশ্যগুলি অনুকৃতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। কখনো বা শিকারের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করে তুলবার জন্য ব্যবহার করা হয় অভিপ্রেত জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হয়ত হরিণের শিং, তার চামড়া, বাইসনের মাথা (পরে এ থেকেই মুখোশের সৃষ্টি) ; কারণ, শিকার ধরতে গিয়ে যে যে বাধা তার সামনে এসে উপস্থিত হয়, তাদের সবাইকে সে জয় করতে চায়। বাস্তবের অভাব সে পূরণ করতে চায়, কিন্তু অভাব পূরণের একমাত্র উপায় মায়াসৃষ্টি। কিন্তু এই মায়াময় জাদু-নৃত্যের ফলে লাভ কী হয় তার? লাভ হয়

এইটুকু যে, নৃত্যের মধ্য দিয়ে অভিপ্রেত বাস্তব-প্রাপ্তির যে-ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে, তারই অনুপ্রেরণা তার মনকে আশাবাদী করে তোলে, জয়ের ইচ্ছাকে দৃঢ় করে। আর তারই ফলে, সত্যি সত্যিই তাকে সেই মুহূর্তের জন্য আরও উপযুক্ত পাকা শিকারী করে তোলে।

যাঁরা পল্ রোবসন অভিনীত এডগার ওয়ালেসের 'স্যাণ্ডার্স অব দি রিভার'-এর চিত্ররূপটি দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভুলবেন না 'উটপাখির পালক' গোষ্ঠীর সিংহ-নৃত্যটি। শত্রুর বিরুদ্ধে নির্মম আক্রমণ চালাবার পূর্বে অনুষ্ঠিত এই নৃত্যটির মধ্যে ধীরে ধীরে সুর ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যে প্রচণ্ড আবেদন চূড়ান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা যেন দর্শককেও অভিভূত করে তোলে; নৃত্যকারী যোদ্ধাদের মনের অবস্থা যে কি হয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সিংহ-নৃত্যটি জাদু-অনুষ্ঠান। স্যাণ্ডি মৃত, কিন্তু তৎসম্পর্কিত ভয়ের স্মৃতি অ-সভ্যদের মধ্যে জীবন্ত। স্যাণ্ডির পরবর্তী রাজকর্মচারী মরবার মুহূর্তেও বলে গেছে যে, স্যাণ্ডি আবার ফিরে আসবে, আর স্যাণ্ডির আইন নিদারুণ। এই ভয়কে জয় করে, শত্রুর ধ্বংস সাধনের জন্য মনকে প্রস্তুত করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। ঠিক এই কারণেই অ-সভ্য মানুষ জাদু-ক্রিয়া সম্পন্ন না করে কোনো কাজে হাত দিতে পারে না। কারণ, বাস্তবের বাধাবিপত্তির মুখোমুখি দাঁড়াবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি তখন তার থাকে না। জাদু অ-সভ্য মানুষের কাছে প্রকৃতি জয়ের অন্যতম হাতিয়ার।

জাদুর উদ্দেশ্য মায়ার জগতে অভিপ্রেত বাস্তবকে লাভ করা। জাদুর ক্রিয়া মনোজগতে। মায়ার সাহায্যে অভিপ্রেত বাস্তবের অভাব পূরণ করে নেওয়াটাই জাদুর মূলগত কথা। কায়িক ও বাচিক অনুকৃতি ছাড়া সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জাদু-অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। হুইকোল ইণ্ডিয়ানদের একটি জাদু-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন কুমারী জেন হ্যারিসন তাঁর বিখ্যাত 'এনসেণ্ট আর্ট অ্যাণ্ড রিচুয়াল' গ্রন্থে। সেটি এই রকম: অনাবৃষ্টির

আশঙ্কা হলে হুইকোল ইণ্ডিয়ানরা মাটির চ্যাপটা থালার এক পিঠে লাল নীল হলদে রং দিয়ে রশ্মি-সংবলিত সূর্য দেবতার মুখ আঁকে; থালার অপর পিঠে সূর্যের গতিপথ আঁকা থাকে। একটি ক্রসের মতো মূর্তি দিয়ে সূর্যের যাত্রাপথ এবং কেন্দ্রমধ্যস্থ একটি বৃত্ত দিয়ে মধ্যাহ্ন বোঝানো হয়। থালার চারপাশে থাকে মৌচাকের মতো অনেকগুলি ঢিবি আঁকা। ঐ ঢিবিগুলি পাহাড়ের প্রতিকৃতি। পাহাড়ের চারপাশে লাল ও হলদে রঙের ছোট ছোট বিন্দু শস্যক্ষেত্র এবং পাহাড়ের উপরের ক্রসগুলি অর্থ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। কোনো কোনো থালায় আবার পাখি, বিচ্ছু, এমন কি বৃষ্টির ধারাও আঁকা থাকে। এই থালাগুলি তারা বৃষ্টি-দেবতার বেদীর উপর রেখে আসে। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য হুইকোল ইণ্ডিয়ানদের কামনা নিবেদন: "সূর্যদেব তাঁর আলোকরশ্মি দিয়ে পূর্বদিকে উদয় হন, তাতেই তাদের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি; তাঁর রশ্মিজাত তাপ ও আলোয় শস্য জন্মায়, কিন্তু তিনি যেন দয়া করে পাহাড়ের মাথায় যে-মেঘ জড়ো হচ্ছে, তাকে বাধা না দেন।" এখানে কায়িক ও বাচিক কোনো অনুকৃতি নেই। বস্তু এখানে রূপ পেয়েছে রেখার মাধ্যমে। এতে লাভ কী হয়? বাস্তব লাভ নিশ্চয়ই নয়। এখানে লাভ কেবল মানসিক। তাদের মন তৃপ্ত হয় এই ভেবে যে, বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করা হয়েছে, তিনি সদয় হবেন। বৃষ্টির দেবতার দয়াই তাদের অভিপ্রেত বাস্তব। সেই অভিপ্রেত বাস্তব রেখার মাধ্যমে অনুকৃত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান তাদের আশঙ্কা দূর করে মনকে তৃপ্ত ও স্থিতাবস্থ করে। অবশ্যই এর আবেদন মায়াময়।

জাদু-অনুষ্ঠান অ-সভ্য মানুষের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা অনুমান করা আজ মোটেই কঠিন নয়। অ-সভ্য সমাজের স্তরে এখনও যে মানব-গোষ্ঠীরা পড়ে আছে, তাদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা জাদু সম্পর্কিত বহুবিচিত্র এবং কৌতূহল-জনক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে,

আফ্রিকার অরণ্য অঞ্চলের অ-সভ্য মানুষের সমাজে এই জাদু-ক্রিয়ার প্রাচীন রূপ আজও চোখে পড়ে। অ-সভ্য সমাজ কেন, আমাদের সভ্য সমাজেও এই জাদু নানা চেহারায় এখনও বেঁচে আছে। রাজনৈতিক শত্রুর কুশমূর্তি দাহ করার ঘটনা রাজনৈতিক জগতে প্রায়ই ঘটে থাকে। কুশমূর্তি দাহ করার মধ্যে স্পষ্টতই প্রকাশ পায় অনুকৃতির মাধ্যমে শত্রুর অভিপ্রেত ধ্বংস কামনা। এটি নির্ভেজাল জাদু। আজও 'আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তি অঙ্গুরী', 'বশীকরণ মাদুলি' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন রোটারি প্রেসে ছাপা কাগজের পাতায় দেখে থাকি। একমাত্র মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদিকে জাদু-ক্রিয়া জেনে আমরা জাদু সম্পর্কে সম্পূর্ণ সংকীর্ণ ধারণা করে বসি। কিন্তু মানুষের কাছে জাদু একদিন অপরিহার্য বস্তু ছিল; সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে জাদুরও বিবর্তন ঘটেছে, যার অসংখ্য চিহ্ন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আজও আমরা বহন করে চলি। আদিম মানুষের কাছে জাদু ছিল তার ধর্ম, তার মতাদর্শ (ideology), এই জাদুর মধ্যেই আদিম মানুষের কৃষ্টি।

এই জাদু থেকেই বিজ্ঞান ও শিল্পকলার জন্ম। মানুষের প্রকৃতি জয়ের প্রচেষ্টার বস্তুগত (objective) দিক বিজ্ঞান, আর কাব্য-কলা তার আত্মগত (subjective) দিক। বস্তুগত দিক যত উন্নত হয়েছে, ততই তার আত্মগত দিকের সঙ্গে ব্যবধান গভীর হয়ে উঠেছে। জাদুর আত্মগত দিকের প্রকাশও অতি বিচিত্র। জাদু-অনুষ্ঠানের অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি এবং বিভিন্ন অনুকার শব্দ থেকে জন্মলাভ করেছে নৃত্য, সংগীত ও যন্ত্রসংগীত। আর জাদু-ক্রিয়ায় অভিপ্রেত বস্তুর রেখার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের প্রকাশভঙ্গি রূপ পেয়েছে চিত্রকলায়।

জাদু ও কাব্য

অ-সভ্য মানুষের কাছে জাদু-অনুষ্ঠান ছিল সর্বক্ষেত্রেই সমষ্টিগত। কারণ, আদিম সমাজ ছিল সমষ্টিগত শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সমষ্টিগত শ্রমের ফলেই ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। মানুষের সমষ্টিগত শ্রমঘটিত বহুবিস্তৃত সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াস থেকেই ভাষার উন্নতি। এই ভাষার আবার দুটি রূপ, একটি দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা, অপরটি কাব্যের ভাষা। কাব্যের ভাষার একাধিক বৈশিষ্ট্য আছে: এ ভাষা গভীর আবেদনশীল, অবাস্তব (fantastic), তাললয়-সমন্বিত এবং মোহকর। কাব্যের ভাষায় তাললয়ের সৃষ্টির মূলে আছে অস্ত্রের (tool) ব্যবহার। এর সঙ্গে কায়িক ভঙ্গিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রমের প্রকৃতি ও ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি থেকেই বিভিন্ন তাললয়ের উৎপত্তি। আদিম সমাজের কথা বাদ দিলেও, এর দৃষ্টান্ত এ যুগেও প্রচুর মিলবে। গুণ-টানা, নৌকা-বাওয়া, ছাদ-পেটানো, চরকা-কাটা প্রভৃতি শ্রমঘটিত কাজের সঙ্গে মানুষ যে-কথা বলে বা গান গায়, তাদের প্রত্যেকের তাললয় ও সুর লক্ষ করবার জিনিস। তাদের পৃথক পৃথক সুর ও তাল শ্রম ও অস্ত্রের প্রকৃতির পার্থক্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

কাব্যের ভাষার আবেদনশীল, অবাস্তব ও মোহকর বৈশিষ্ট্য-গুলি সম্ভব হয়েছে জাদু-সম্পৃক্ত হয়ে। বাক্‌ভঙ্গি ও কায়িকভঙ্গি ব্যতিরেকে জাদু সম্ভবই নয়। জাদুর মূল কথা মায়া (illusion) সৃষ্টি। মায়া সৃষ্টি করতে গেলে কল্পনার সাহায্য অপরিহার্য। আর জাদু-সৃষ্ট মায়া স্বতঃই আবেদনশীল। কারণ, জাদুর অনুষ্ঠানে বাস্তব

ও কল্পনার বিরোধিতা মায়ার জগতেই সমন্বয় লাভ করে। তারই ফলে, সমষ্টিভুক্ত মানুষ অভিভূত না হয়ে পারে না। এই জন্যই কাব্যের ভাষার মধ্যে জাদুর সব গুণগুলিই বর্তমান। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আদিম কাব্যের প্রকৃতি আজকের কাব্য থেকে অনেক পৃথক। আদিম কাব্য আর সংগীতে কোনো পার্থক্যই ছিল না। আর এই কাব্য বা সংগীত ছিল সর্বক্ষেত্রে কায়িকভঙ্গি ও যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে জড়িত। নৃত্য, সংগীত ও কাব্য একই জন্মসূত্রে আবদ্ধ। এদের মধ্যে প্রথমে পৃথক হয়েছে নৃত্য। তারপর ধীরে ধীরে সংগীত থেকে পৃথক হয়েছে কাব্য। সংগীতে কাব্যাংশ হচ্ছে ভাববস্তু (content), আর কাব্যে সংগীতাংশ হচ্ছে তার বহিরঙ্গ (form)। বহিরঙ্গকে (form) অপ্রধান রেখে যখনই ভাববস্তু প্রাধান্য লাভ করেছে, তখনই পৃথক হয়ে পড়েছে বিশুদ্ধ কাব্য। কাব্যে সংগীতাংশ সহজ এবং সরল। অন্যদিকে সংগীতে কাব্যাংশ অর্থাৎ ভাববস্তু প্রধান্য লাভ না করায় বহিরঙ্গের জটিলতা ও সূক্ষ্মতায় পৃথক শাখার উদ্ভব হয়েছে। কাব্যে একটি সুসংবদ্ধ বক্তব্য অথবা কাহিনী প্রয়োজন। কাব্যের এই কাহিনী অথবা বক্তব্য ক্রমশ সংগীত-নিরপেক্ষ হওয়ায় অতিআধুনিক যুগে সৃষ্টি হয়েছে গদ্যকাব্য উপন্যাসের—যার মধ্যে তাললয়-সমন্বিত ভাষাকে স্থানচ্যুত করেছে দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষা।

আবার অন্যদিকে, ভাষাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে সৃষ্টি হয়েছে ঐক-সংগীতের (sympohny)। অধ্যাপক টমসনের ভাষায়ঃ "ঐক-সংগীত আধুনিক উপন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। উপন্যাস তাললয় বর্জিত ভাষা, আর ঐক-সংগীত ভাষাবর্জিত তাল আর লয় মাত্র। উপন্যাসে কাহিনীর ঐক্য এবং বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রাখাটাই বড় কথা; উপন্যাসের বিষয়বস্তু গৃহীত হয় দৈনন্দিন জীবন থেকে। কিন্তু তাললয়ের একটা মোটা কাঠামো ছাড়া ঐক-সংগীতের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে কোনো ঐক্যই নেই: আর এর বিষয়বস্তুও আহরিত হয় সম্পূর্ণ

ভাবে কল্পজগৎ থেকে।” সংগীত থেকে কাব্য পৃথক হয়ে পড়ায় এবং কাব্য ক্রমশঃ তাললয় বর্জিত হওয়ার ফলেই লুপ্ত আদিম অবাস্তবতার সবটুকুই যেন আশ্রয় নিয়েছে আধুনিক ঐক-সংগীতে।

জাদু থেকে কাব্যের উদ্ভব হয়েছে একথা স্বীকার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আদিম কাব্যের কবি কে? আদিম মানুষের সমাজ-জীবনে কবির স্থান কোথায়?—মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এই প্রশ্ন আলোচনা করবার সময় বর্তমান সভ্য সমাজের ও আদিম অ-সভ্য সমাজের মূল প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আদিম অ-সভ্য সমাজের ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণভাবে সমষ্টিগত শ্রম ও অধিকারের উপর। সে-সমাজ ছিল দরিদ্র; সমষ্টিগতভাবে বিচরণ না করলে সে-সমাজের অস্তিত্বই বজায় থাকত না। সে সমাজের বিরোধিতা ছিল সম্পূর্ণভাবে সমষ্টি ও প্রকৃতির মধ্যে, সমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ছিল অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। বর্তমান সভ্য সমাজ এর বিপরীত। এ সমাজের বিরোধিতা মূলত ব্যষ্টিও সমষ্টিতে। সভ্য সমাজ অনেক কিছু লাভ করেছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গেই তার ভাগ্যে জুটেছে এক অভিশাপ—ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরামহীন বিরোধিতা: শ্রমবিভাগ এ সমাজে পরিণত হয়েছে শ্রেণীবিভাগে। এ সমাজের আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত কিছুর মূল্য নিরূপিত হয় এরই ভিত্তিতে।

এই সভ্য সমাজের কবি এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত; সে এককও বটে। সভ্য সমাজে কাব্য রচিত হয় নির্জনে। সে-কাব্য লিপিবদ্ধ হয়, প্রকাশিত হয় এবং পাঠকও সে-কাব্য পাঠ করে নির্জনে এককভাবে। কিন্তু আদিম কাব্য ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে-কাব্য কোনো সময়েই লিখিত ছিল না, নির্জনে রচনাও হত না। সমবেত অনুষ্ঠানে সামাজিক সমসূত্রে গ্রথিত আদিম মানুষমাত্রেরই মনে থাকত সে

কাব্যের বিষয়বস্তু ও উপাদান। প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজে কবি ছিল প্রত্যেকেই ; কারণ, যে-কারণে কাব্যের অনুভূতি জাগে, সে-কারণগুলি প্রত্যেকের মনে থাকত অল্পবিস্তর সমানভাবে আবেদনশীল। সে-সমাজে একক মানুষের অস্তিত্ব ছিল না বলেই অসম্ভব ছিল একক চিন্তার।

আদিম কাব্য সর্বদেশে ও সর্বকালে ধর্মসম্পৃক্ত। আদিম ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থ একই জিনিস। "ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্গত রয়েছে এবং তারাই বড় বড় হয়ে ক্রমে স্ব স্ব প্রধান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে—ধর্ম ও শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসের মূলে এই কথা রয়েছে দেখি।"—(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত পৃঃ ৫৮) কারণ, জাদু এদের সকলেরই জন্মদাতা। জাদু-অনুষ্ঠান ধর্মানুষ্ঠান ; সেই অনুষ্ঠানের উদ্‌গীত কামনাই কাব্য, সেই কামনাই বেদ-বাইবেলের স্তোত্র, মন্ত্র। আদিম কাব্যের মূল কবি একজন ছিল বৈ কি। সে ছিল সমাজ বা গোষ্ঠীর নেতা অথবা জাদু-অনুষ্ঠানের প্রধান বা পুরোহিত, ঋষি। যে-কোনো সমবেত অনুষ্ঠানেই একজন নেতার প্রয়োজন ছিল যে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করত। তাকে কেন্দ্র করেই আর সকলের ক্রিয়াগুলি সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করত। এই নেতার অবশ্যই কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানের সময়কার উদ্‌গীত ভাষণ, মূলত তারই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হত। তার ভাষণের সঙ্গে প্রত্যেকেরই মনের যোগ থাকতে বাধ্য। তাই এই ভাষণগুলি প্রতিটি মানুষকে অভিভূত করত। অনুষ্ঠান একাধিকবার অনুষ্ঠিত হবার ফলে ভাষণগুলি মার্জিত ও নতুনভাবে সংযোজিত হওয়ার সুযোগ পেত।

আদিম সমাজের ক্রমবিবর্তনে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক জটিল ও বহুবিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাদু-অনুষ্ঠানের নেতা পৃথক হয়ে পুরোহিত শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। তাদের সামাজিক কর্ম ক্রমশ নির্দিষ্ট

হয়েছে, তা আবার বংশানুক্রমে অনুশীলনের দ্বারা সূক্ষ্মতা, কুশলতা ও চাতুর্য লাভ করেছে। কিন্তু কবি আখ্যাধারী ব্যক্তিটি জাদু-অনুষ্ঠানের এই পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নয়। বেদে যে-কবির বারংবার উল্লেখ পাওয়া যাবে, সেই কবি সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থে কবি কখনই নয়। সে 'কবি' ঋষি এবং পুরোহিতের সঙ্গে একার্থবাচক।

আদিম কবির সঙ্গে শ্রোতার মনটি বাঁধা ছিল এক তারে। সংবেদশীল শ্রোতা না হলে তার পক্ষে অসম্ভব ছিল কাব্য সৃষ্টি করা। শ্রোতাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আদিম কবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্যের ভাববস্তুকে তাললয়-সমন্বিত, মোহময় ভাষায়, সুর ও অঙ্গবিক্ষেপের সাহায্যে রূপ দিয়ে যেত। কবি কাব্যের অনুপ্রাণনা (Inspiration) লাভ করার সঙ্গে শ্রোতা ও দর্শক সকলেই আত্মহারা হয়ে উঠত। গ্রামাঞ্চলের রামায়ণ-গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা গ্রাম্য ও অসংস্কৃত শ্রোতাদের আসরে বসে আত্মহারা হবার দৃশ্যটি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। রামের বনবাসে, দশরথের শোকে অথবা বন্দিনী সীতার দুঃখে গায়কের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদেরও চোখে জল, মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি। রামায়ণ-গানের মধ্যে কবি ও শ্রোতার সম্পর্কের আদিম রূপটি এখনো অনেকখানি বেঁচে আছে। অ-সভ্য সমাজের জাদু-অনুষ্ঠানের সময় থেকে শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে রাম বা অনুরূপ বীরের কাহিনী গান করার সময়ের মধ্যে অবশ্যই বহু শতাব্দীর ব্যবধান। কিন্তু এদের মধ্যকার যোগসূত্রটি কখনই ছিন্ন হয় নি।

আদিম জাদু-অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও সংগীতের প্রয়োজন আর পরবর্তীকালের প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে প্রচুর। কারণ, মানুষের উদ্যমে নতুন নতুন অস্ত্রের উদ্ভব হওয়ায় তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথ সুগম হয়েছে বলেই বাস্তব বিরোধিতার সম্মুখীন হবার ক্ষেত্রে মানুষের কাছে ক্রমশ জাদুর ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এক কথায় জাদু-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য থেকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনটি ক্রমশ দূরে সরে গেছে। কিন্তু জাদুর মৃত্যু ঘটে নি।

আগে যেখানে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য জাদু-অনুষ্ঠান অপরিহার্য ছিল, পরবর্তীকালে খাদ্য সংগ্রহের উপায় সহজতর হলে জাদু সেখানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লেও, তার প্রয়োজন ঘটেছে দৈব-দুর্বিপাক, মহামারী, ব্যাধি ইত্যাদি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে—যেসব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কারণগুলিকে আয়ত্ত করতে মানুষকে আরও বহুকাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাই ব্যবহারিক জীবন থেকে জাদু ক্রমশ সরে এলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। জাদু বেঁচে আছে ধর্মসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে তার সংস্কৃত ও অসংস্কৃত রূপ নিয়ে। সভ্যতার ক্রমোন্নতির ফলেই জাদু সরে গেছে দৈনন্দিন জীবন থেকে। আর সেই জন্যই জাদু থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে একে একে কাব্য, সংগীত, নৃত্য। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে বহু শতাব্দী ধরে যুক্ত ছিল ধর্মানুষ্ঠান ও দেবমন্দিরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে। "এক সময়ে দেবমন্দিরের সঙ্গে নাটমন্দির এবং পূজাপার্বণের সঙ্গে দেবতার চরিত বর্ণন ক'রে চন্দনযাত্রা রামযাত্রা রুক্মিণীহরণ এমনি নানা অভিনয় ও চিত্রকার্য জড়িয়ে ছিল; এখন তারা সে সম্পর্ক, সে গলাগলি ভাব ছেড়েছে; ধর্মমন্দিরে, নাটকের রঙ্গমঞ্চে ও শিল্প-প্রদর্শনীতে সুনির্দিষ্ট ভাগ হয়েছে।"—(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃঃ ৫৮)। তাই এদের ক্রমবিবর্তনের পথ খুঁজে বার করতে হলে দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতেই হবে।

আধুনিক সভ্য সমাজে কবি আদিম কবি থেকে অনেক স্বতন্ত্র। প্রকৃতি জয়ের কত অসংখ্য অস্ত্র তার সমাজজীবন তথা মনোজীবনকে উন্নত, জটিল ও সূক্ষ্ম করেছে; কত শতাব্দীর মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার, জয়-পরাজয়ের ঐতিহ্যে তার মন পুষ্ট। তাই সভ্য যুগের কবির কাব্য এত জটিল, ঐশ্বর্য ও ব্যঞ্জনাময়, এত প্রচণ্ড শক্তিমান। অপর দিকে, সভ্য সমাজের কবির মনোজগতে যে দ্বন্দ্ব তা আদিম কবির দ্বন্দ্ব থেকেও স্বতন্ত্র। তার দ্বন্দ্ব ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, আদিম মনোজীবনের সহজ সরল প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব নয়। জাদুর ভিত্তি

ছিল প্রকৃতি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, কিন্তু এ সমাজের কবির কাব্যের ভিত্তি—ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব। কিন্তু বাস্তব দ্বন্দ্বকে মায়ার জগতে সমন্বয় সাধন করা উভয়েরই উদ্দেশ্য। তাই দুই সমাজের কবির মধ্যে যে পার্থক্য তা মূলগত নয় কখনই। আদিম জাদু-অনুষ্ঠানের মৌলিক প্রেরণা ও সভ্য সমাজের কবির কাব্যরচনার মৌলিক প্রেরণায় ইতরবিশেষ নেই। আদিম জাদু-অনুষ্ঠানের পরিচালক বা নেতা আর সভ্য যুগের কবি একই ব্যক্তির ক্রমপরিবর্তিত রূপমাত্র।

কাব্যের মূল রহস্যটি কী? এর রহস্যকে অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বলে ভাববাদীরা ব্যাখ্যা করে থাকেন। যুক্তি, তথ্য ও মনোবিজ্ঞান প্রয়োগে দেখা যায় যে, কাব্য বাস্তব থেকে জাগ্রত চৈতন্যকে অপসারিত করে মায়ার জগতে প্রেরণ করে—যে জগতে চিত্ত দ্বন্দ্বহীন এক অসীম আনন্দ লাভ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হাজার রকমের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিমানসকে পীড়িত ও খণ্ডিত করে রাখে। জাগ্রত চৈতন্যে এই দ্বন্দ্বগুলি সক্রিয়, কিন্তু কাব্যের ছন্দ, তাললয় ও মোহময় ভাষার সাহায্যে সৃষ্ট স্মৃতির উদ্বোধনে এই দ্বন্দ্বগুলি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করে; সে অবস্থায় সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে ব্যক্তিমানসের বাসনা-কামনার নিরঙ্কুশ লীলার সুযোগ ঘটে। কাব্যোপলব্ধির এই অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেও ক্ষতি নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, পাঠকের মনে কাব্য যে উপায়ে উপলব্ধি ঘটায়, ঠিক একই উপায়ে কবির মনে উক্ত কাব্যের উপলব্ধি ঘটে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাঠক যা উপলব্ধি করেন তা কেবলমাত্র কবির উপলব্ধিই নয়, তা পাঠকের নিজস্ব উপলব্ধিও বটে। কবি ও পাঠকের মন সমসূত্রে বাঁধা, কাব্য হচ্ছে 'সহৃদয়হৃদয়-সংবাদী'। এ যুগের কবি ও তাঁর পাঠকের মধ্যে যে সম্পর্ক, জাদুর যুগের আনুষ্ঠানিক পরিচালক ও তার গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক সেই একই ছিল।

জাদু থেকে কাব্যের উৎপত্তি হয়েছে একথা স্বীকৃত হলে, আমরা যাকে কাব্যের অনুপ্রাণনা (inspiration) বলি, সে জিনিসটির ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। যখন কবি সঙ্গতিহীন বাস্তব থেকে চৈতন্যকে বিচ্যুত করে মায়ার জগতে প্রেরণ করেন এবং যখন এই মায়ার জগতে সমাজ ও ব্যক্তি-মানসের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধি ঘটে, তার তখনকার অবস্থাকেই বলি অনুপ্রাণিত (inspired) অবস্থা। সেই মায়ার জগতের উপলব্ধির প্রকাশই তার কাব্যে রূপায়িত হয়। এই অভিভূত অবস্থায় কবি যা উপলব্ধি করে, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে তা ঘটে না; কিন্তু উপলব্ধ সত্য কাব্যের মাধ্যমে পাঠকের মনের সমর্থন পায় বলেই কবির জনপ্রিয়তা।

কাব্যের অনুপ্রাণনা (inspiration), যোগের সমাধি ও লৌকিক ভর-করা (possession) মূলত একই জিনিসের প্রকারভেদ মাত্র। বাস্তবকে অতিক্রম করে তুরীয় মার্গে চিদানন্দ লাভ করা যায় যে অবস্থায়, তার নাম সমাধি; আর স্নায়বিক দুর্বলতাবশত যখন মানুষের সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত চৈতন্যকে পরাভূত করে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনকার সেই অবস্থার নাম ভর-করা। তিনটিই মূলত এক, আশ্রয় বিভিন্ন। কবির অনুপ্রাণিত অবস্থা আর গ্রাম্য লোকের ভর-করার অবস্থার পার্থক্য দুজনের মানসিক পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত।

আদিম মানুষের মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মগ্নচৈতন্যের কামনা-বাসনা তাই তাকে অতি সহজেই অভিভূত করতে সক্ষম ছিল। এই জন্য জাদুর প্রভাব ছিল তাদের মনের উপর অসাধারণ প্রভাবশালী। জাদু-অনুষ্ঠানে তাই নৃত্য-গীতের মাধ্যমে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটত, তা হত অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, স্থূল এবং উদ্দাম। কিন্তু সভ্য-সমাজের মানুষের মন আদিম মানুষের তুলনায় অনেক বেশী দৃঢ় এবং ঘাতসহ। তাই এ সমাজের কবির অনুপ্রাণনা ঘটার কারণও অতি জটিল ও সূক্ষ্ম; অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত কাব্যও আদিম কাব্য থেকে

অনেক বেশী সূক্ষ্ম, জটিল ও ব্যঞ্জনাময়। এ যুগের অনুপ্রাণনার কারণটি আমরা আবিষ্কার করেছি, কিন্তু অতীতের কবিরা তাদেব অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণটি বুঝে উঠতে পারত না বলেই ব্যাখ্যা করত অন্যভাবে। তারা বলত দৈবী-প্ররণা, দেবতার ভর। তাদের মতে, দেবতার বাণীই তাদের মুখ থেকে উদ্গীত হত। আর এই জন্যই আদিম মানুষ কবি ও ভবিষ্যবাকের (prophet) কোনো পার্থক্য দেখতে পেত না। অবশ্য এদের মধ্যে পার্থক্যও কিছু নেই। এ যুগে আমরা কবিকে বলি 'ঋষি', বৈদিক যুগের আর্যেরা ঋষিদের বলতেন 'কবি'। ভবিষ্যবাক্ ও কবির মধ্যে পার্থক্য নেই বলেই কাব্য ও ভবিষ্যবাণীতেও (prophecy) মূলত কোনো পার্থক্য নেই। কবির উপলব্ধ সত্যই ভবিষ্যবাণী আর তার ছন্দোময় রূপ কাব্য। আদিম মানুষের কাছেও কাব্য ও ভবিষ্যবাণীর মধ্যে কোনো সীমারেখা ছিল না।

জাদু ও মহাকাব্য

অ-সভ্য মানুষের কাছে সত্য ও কল্পনা, জ্ঞান ও কুসংস্কারের মধ্যে কোনো সীমারেখাই ছিল না। তার জৈবিক ও মানসিক—সমগ্র সত্তার একটি মাত্র মূল প্রেরণা ছিল—প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেকে টিকয়ে রাখার প্রেরণা। জাদুর মধ্যে প্রতিফলিত হত তার এই সত্তার সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা। কুসংস্কার থেকে জ্ঞানকে, কল্পনা থেকে সত্যকে পৃথক করে নিতে তার বহু হাজার বছর সময় লেগেছে। এরা পৃথক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাদু থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে মানুষের মানস-ভোজের বিচিত্র উপাদানগুলি। ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জাদু ওতপ্রোতভাবে বহুকাল মিশে থাকলেও পরবর্তীকালে মানুষের বহু ধর্ম জাদুর প্রত্যক্ষ চিহ্নগুলিকে পরিহার করতেও চেষ্টা করেছে। তাই জাদু সভ্য মানুষের জীবন থেকে বিতাড়িত হয়ে আজকের দিনে বেঁচে আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে, ডাইনি-ওঝার তুকতাকের মধ্যে।

কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই যে, ডাইনি-ওঝাদের তুকতাকই আমাদের আদিমতম সঙ্গী, আমাদের মনো-জগতের যা কিছু সৃষ্টি, তাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। ভারতীয় প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র (কাব্যও বটে) বেদের চতুর্থ অংশ অথর্ববেদ। অথর্ববেদ তুকতাক ও তন্ত্রমন্ত্রের, এক কথায় জাদুবিদ্যার শাস্ত্র। একে বেদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু পণ্ডিতেরা অথর্ববেদের ধর্মানুষ্ঠানকে ঋক্‌-যুগের ধর্মানুষ্ঠানের পূর্ববর্তী বলে অনুমান করেন। তাঁদের এ অনুমান যুক্তি ও বিজ্ঞানসিদ্ধ।

জাদু থেকে কাব্য পৃথক হতে বহু শতাব্দীর পথ অতিক্রম করেছে। জাদু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কাব্যের নজির মেলে সভ্য যুগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই সভ্য যুগের প্রকৃতির যে যে বৈশিষ্ট্যের ফলে আমরা তাকে অ-সভ্য যুগ থেকে আলাদা করে নিতে পারি, তার মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এ যুগে একটি অবসরভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি। এই অবসরভোগী শ্রেণীই শাসকশ্রেণী। এই যুগের সামাজিক বিশ্বাসে এই শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায়ের জন্য অর্থনৈতিক শ্রমের প্রয়োজন নেই। আর সেইজন্য আদিম জাদুর প্রত্যক্ষ প্রয়োজনও তার কাছে মূল্যহীন। সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এই শ্রেণী ; এবং এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (শক্তি, সাহস, ঐশ্বর্য ও চাতুর্যে) সমাজের প্রধান বা নেতা।

আদিম জাদু-অনুষ্ঠানের নেতা পুরোহিত ও কবিরূপে এই যুগে গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনক্ষেত্র ছেড়ে অবসরভোগী শ্রেণীর দরবারে অনুগ্রহের ছত্রচ্ছায়ায় স্থান গ্রহণ করেছে। এ যুগের কাব্য তাই জাদু-অনুষ্ঠানের সমবেত সংগীত নয়, কবি বা পুরোহিতের একক সংগীত (solo)। "রাজা বা প্রধান যখন পারিষদবর্গ নিয়ে অবসরবিনোদনে রত, তখন কবি গান ধরে বীণা বাজিয়ে। গানের সঙ্গে কখনো নাচতেও হয় তাকে কথা, সুর আর অঙ্গভঙ্গিকে সুসংবদ্ধ রূপ দেবার জন্য ; কারণ প্রাচীন (সমবেত জাদু) অনুষ্ঠানে এগুলি ছিল অবশ্যকরণীয়। একক হলেও তাকে পরিচালক ও অন্যান্য সকলের অংশও সম্পন্ন করতে হয়। কবিকে একক গান গাইতে হয় ; আবার ধুয়াও ধরতে হয় তাকেই।"—(এম, ইলিন : হাউ ম্যান বিকেম এ জায়াণ্ট, পৃঃ ২৭৬)।

কিন্তু তার এ সংগীতের বিষয়বস্তু কি ? অ-সভ্য সমাজের জাদু-অনুষ্ঠানের অনাবৃষ্টি বা শিকারের বিশদ বর্ণনা নয়। তার বিষয়বস্তু দেবতা অথবা বীরের কাহিনী, রাজার স্তুতি, শত্রুর উৎসাদনকারী নেতার বীরত্ব, যুদ্ধে নিহত বীরের শোক-গম্ভীর গাথা (ballads) অথবা প্রতিহিংসার রোমাঞ্চকর ঘটনা। তার এ সংগীত তন্ত্র-মন্ত্র বা

জাদু-অনুষ্ঠানের অর্থহীন মোহকর শব্দসমষ্টি নয়, ঘটনা ও চরিত্রে সুসংবদ্ধ কাহিনী—বাস্তব মানুষের জীবন থেকে আহরিত শব্দ, সুর-সম্বন্ধ ঘটনা ও চরিত্রের অনুকৃতি।

হোমারের পরবর্তী যুগে এই ব্যাপার ঘটেছে প্রাচীন গ্রীসদেশে, এই ব্যাপার ঘটেছে এদেশেও। বৈদিক সূক্ত থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় রাজার সঙ্গেই কবি বা পুরোহিতের বংশানুক্রমিক সম্পর্কের। বৈদিক কবির কাজ ছিল রাজা ও তাঁর শাসিত প্রজার গুণ, বীরত্ব, ও ঐশ্বর্য কীর্তন করা। একটি সূক্তে বলা হচ্ছে: "স্তুতি শুনে রাজা যেমন খুসী হন, দুধ মেশালে তেমনি সোম পবিত্র হয়।" (এখানে উপমাটি লক্ষণীয়। কোন বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য না হলে উপমান হিসাবে উপস্থিত করা হয় না)। যিনি বৈদিক রাজার স্তুতিগায়ক তিনিই সূক্তকার, আবার তিনিই রাজার পুরোহিত। আমরা এযুগে তাঁদের বলি ঋষি। তাঁদের রচিত দেবতা ও নৃপতির স্তুতি ও বীরত্বগাথাই বেদের বিষয়বস্তু।

পুরোহিত ও কবি বহুকাল ধরে একই ব্যক্তি ছিল। কারণ, কাব্য ও ধর্মানুষ্ঠান জড়িত ছিল ওতপ্রোতভাবে; আর ছিল ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিতের একচেটিয়া অধিকার। বহুকাল পর্যন্ত ধর্মানুষ্ঠানে আবশ্যিক ও অপরিহার্য ছিল কাব্য-সম্পর্কিত নৃত্য ও গীত, কায়িকও বাচিক ভঙ্গি। পুরোহিত ও কবি শ্রেণীহিসাবে পৃথক হয়েছে অনেক পরে। যেখানে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ অনেক বেশি রকমের দৃঢ়—যেমন ভারতীয় সমাজে—সেখানে দেখা যায়, কবি ও পুরোহিত প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত হাত ধরাধরি করে এসেছে। কবিও পুরোহিতের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে প্রকৃতপক্ষে অতি-আধুনিক যুগে।

সভ্য যুগের প্রথম দিকের কবির রচিত বীর ও রাজন্যচরিতগাথারই (ballad) পরবর্তী মহিমান্বিত ও বৃহত্তর সংস্করণ মহাকাব্য (epic)। পৃথিবীর সব জাতিরই প্রাচীন সাহিত্যে মহাকাব্য বিশিষ্ট আসন গ্রহণ

করে আছে। কোনো রাজা বা রাজবংশের কাহিনী যুগ-যুগান্ত ধরে শব্দাকারে গ্রথিত ও বর্ধিত হয়ে যে মহাকাব্যের সৃষ্টি, পরবর্তীকালে কোনো কবি বা কবি-সম্প্রদায় তা লিপিবদ্ধ করেছে। মহাকাব্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, বহুকাল ধরে বহু কবির কল্পনা ও শব্দসম্ভারে মহাকাব্য সমৃদ্ধ। হোমারও 'ইলিয়াদ' 'অদেসী'র রচক নন, বাল্মীকি ও বেদব্যাসও 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' রচক নন। প্রাক্-ইতিহাস যুগের ট্রয়ের মর্মান্তিক ধ্বংস, ইউলিসিসের অসাধারণ বীরত্ব, প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের মহিমা এবং কুরু-পাণ্ডবের ভয়াবহ ভ্রাতৃযুদ্ধ একদিন সত্য ঘটনাই ছিল—আরগস ও ইথাকা, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের গুণমুগ্ধ কবিদের সে কাহিনী অনুপ্রাণিত করেছিল। তার ফলে তারা যে গাথা রচনা করেছিল, বহুকাল ধরে বহু ধর্মানুষ্ঠানে তা গীত হয়েছে। বংশানুক্রমিকভাবে কবিরা সেই সম্পদকে রক্ষা করেছে; 'শতেক যুগের কবিদলের' মিলিত প্রতিভায় সৃষ্টি হয়েছে বিশাল মহাকাব্যের। হোমার কে ছিলেন তার সন্ধান আজ মিলবে না, সন্ধান মিলবে না বাল্মীকি-বেদব্যাসের। কিন্তু হোমারের নামে উদ্‌বুদ্ধ 'হোমেরিদাই' বা হোমারের সন্তানেরা এবং ভরতের সন্তান 'ভাটেরা' সুদূর অতীতের বীরত্বকাহিনীকে মুখে মুখে বহন করে এনেছে। একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, একদা এই 'হোমেরিদাই' ও 'ভাটেরা' বংশগতভাবেই সম্পর্কিত ছিল।

মহাকাব্য আগেকার দিনে আজকের মতো পঠিত না হয়ে গীত হত। লবকুশ বীণাসংযোগ প্রথম রামায়ণ গান করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে বলেছেন: "পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়্‌জ্, ঋষভ্ প্রভৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সমলয়ে গানের যোগ্য।" (বালকাণ্ড ৪।৮)। প্রাচীন গ্রীসের 'হোমে-রিদাই'রা বিশ্বাস করত যে, হোমার বীণাযোগে গান করতেন তাঁর কাব্য। পরবর্তীকালে 'হোমেরিদাই'রা অনুষ্ঠান সময়ে হাতে একটি করে দণ্ড ধারণ করতো। বিশেষজ্ঞদের মতে দণ্ডটি প্রাচীনকালে

ব্যবহৃত বীণার প্রতিকল্প। মহাকাব্য গীতের ক্ষেত্র ছিল ধর্মোৎসব। রামায়ণ গীত হয়েছিল রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়। পরীক্ষিতের সর্প যজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম পঠিত হয়েছিল মহাভারত। ধর্মানুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও আজও নিষ্ঠাবান ভারতীয় হিন্দুর কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে মহাকাব্য পঠন ও শ্রবণ আবশ্যিক কর্ম।

গীত বিবর্জিত হয়ে মহাকাব্যের বিশুদ্ধ পাঠ-কাব্য রূপপ্রাপ্তি সম্ভব হল কি করে? অদেসীতে চারবার ভাটের সংগীতানুষ্ঠানের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। প্রথম অনুষ্ঠানে কেবল বীণাসংযোগে গীতের উল্লেখ পাই। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি প্রথমটির মতো হলেও বীণার সঙ্গে নৃত্যের উল্লেখও আছে। অপর দুই অনুষ্ঠানে দেখতে পাই, ভাট গাইছে আর তার সঙ্গে রয়েছে সমবেত নৃত্য (chorus dancing) এগুলি থেকেই মহাকাব্য গীতের প্রাচীন রূপটি চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আর যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে, আদিম অনুকার নৃত্যানুষ্ঠানের পরিচালক এবং সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা অনেকদিন ধরেই বেঁচে ছিল মহাকাব্য গীতানুষ্ঠানের একক ও ধূয়ার মধ্যে। পরিচালক বা এককের ভূমিকার উপর জোর দেওয়ার কালক্রমে সমবেত ও ধূয়ার ভূমিকা অপ্রধান হয়ে পড়েছিল। তার উপরে একক ভূমিকা থেকে বাদ্যযন্ত্রটি বর্জিত হওয়ায় সংগীতবর্জিত বিশুদ্ধ পাঠ-কাব্যের ক্রমিক বিবর্তনটি সম্পূর্ণ হয় এবং মহাকাব্য তখন থেকেই পঠনযোগ্য হয়ে ওঠে।

মহাকাব্য খাঁটি অর্থে কখনই আবৃত্তি করা হয় নি একেবারে আধুনিককাল ছাড়া। প্রাচীন ভারতে দেবমন্দিরে মহাকাব্য আবৃত্তির রেওয়াজ ছিল। সপ্তম শতকের কাদম্বরীতে দেখি, রাণী শিবের মন্দিরে চলেছেন মহাকাব্য আবৃত্তি শুনতে। এই শতকের একটি অনুশাসনে দেখতে পাই সুদূর কাম্বোজে ব্রাহ্মণ সোমশরণ নিয়মিত আবৃত্তির জন্য দেবমন্দিরে মহাভারত উপহার দিয়েছেন। মহাভারতের শেষদিকে মহাকাব্য আবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। একথা জোর

করেই বলা যেতে পারে যে, এ আবৃত্তি আধুনিক অর্থে আবৃত্তি কখনই ছিল না, সংগীত না হলেও এতে সুরের প্রাধান্য মোটেই কম ছিল না।

মহাকাব্যগীতের প্রাচীনরূপটি আমাদের দেশে বহুকাল বেঁচে ছিল। আসরে রামায়ণ গান করা হত বলেই সাধারণভাবে জিনিসটা এখনো 'রামায়ণ গান' নামে পরিচিত। এতে আসরে একজন মূল গায়েন কাহিনী বিবৃত করে বিভিন্ন সুর সংযোগে, কখনো কখনো বা ব্যাখ্যাও করে শ্রোতার বুঝবার সুবিধার জন্য এবং বিভিন্ন রস, এমনকি হাস্য-রসটি সৃষ্টি করতেও ভোলে না। তার সঙ্গীরা ধূয়া ধরে থেকে থেকে। রামায়ণ গানের এই পদ্ধতিটি এখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি এদেশ থেকে। এই পদ্ধতির প্রকার ভেদও আছে। কোথাও 'পাঠক' ও 'ধারক' এই দুই দলে ভাগ হয়ে এক দল কাহিনী অংশ বিবৃত করে যায়, অপর দল ধূয়া ধরে তাল ও সুরের সঙ্গতি রক্ষা করে। এই অনু-ষ্ঠানের মধ্যে নাটকীয় হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গীর প্রাচুর্য মোটেই কম থাকে না। বিষয়বস্তুর ভাব অনুযায়ী মূল গায়েন স্বাভাবিকভাবেই নাটকীয় রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মহাকাব্য গীত পদ্ধতির সহজ, সরল ও পরবর্তী রূপ কথকতা। কথক কাব্যাংশ আবৃত্তি করে, মাঝে মাঝে আবার সুরসংযোগে কাব্যাংশকে সংগীতে রূপান্তরিত করে। কথকতার আবৃত্তাংশের বাহুল্য বেশি এবং কথক সম্পূর্ণভাবে একক।

নির্দেশিকা

আদিম জাদু সম্পর্কে ভালো আলোচনার বই হচ্ছে জেমস জি. ফ্রেজারের 'দি গোল্ডেন বাও'; ধর্মানুষ্ঠান ও শিল্পকলা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো বই: জেন ই. হ্যারিসনেব 'এনসেণ্ট' আর্ট অ্যাণ্ড রিচুয়াল'। জাদু, ধর্মানুষ্ঠান ও শিল্পকলা সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বই ক্রিস্টোফার কডওয়েলের 'ইলিউসন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি'। জর্জ টমসনের লেখা 'মার্কসিজম অ্যাণ্ড পোয়েট্রি' নামে অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিও এসম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান। জেন ই. হ্যারিসনের গবেষণার উপর ভিত্তি করে লেখা হলেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' বইটি মৌলিক রচনা। এ সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ বাংলায় কিছু লেখেন নি।

গ্রীক নাটকের জন্মকথা

গ্রীক দেবতা দিঅনিসাসের পূজাউৎসব থেকে গ্রীক নাটকের জন্ম। দিঅনিসাসে গ্রীক দেবগোষ্ঠীতে পরবর্তীকালের যোজনা। তিনি কুলীন দেবতা নন, দেবরাজ জেউস ও থিবির রাজকন্যা সেমেলের সন্তান। সেমেলের অনুরোধে জেউস স্ব-মহিমায় আবির্ভূত হলে তৎক্ষণাৎ আগুনে পুড়ে সেমেলের মৃত্যু ঘটে। তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে জেউস নিজের উরুতে রক্ষা করেন। যথাকালে দিঅনিসাসের জন্ম হলে কুরোতিদের হাতে লালন-পালনের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু ঈর্ষিতা হেরার প্ররোচনায় টাইটানরা শিশু দিঅনিসাসকে হত্যা করে। জিউস জানতে পেরে টাইটানদের বজ্রের আঘাতে চূর্ণ করেন ও দিঅনিসাসকে পুনর্জীবিত করেন। দিঅনিসাসই একমাত্র গ্রীক দেবতা, যাঁর পিতা দেবতা কিন্তু মাতা মর্ত মানবী।

হোমার মাত্র চারবার দিঅনিসাসের উল্লেখ করেছেন। হোমারের যুগে তিনি ছিলেন অ-প্রধান দেবতা। অনেকের মতে তিনি গ্রীক নন, মূলত এশিয়া মাইনরের আধা-গ্রীক, ফ্রিজিয় ও লিডিয়দের দেবতা। এই জন্যই থ্রেস ও থিবিতে পদার্পণের সময় তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এশিয়া মাইনর থেকে তাঁর আগমন প্রথম ইজিয়ন সমুদ্রের উত্তর কূলে, সেখান থেকে ক্রমশ দক্ষিণমুখে গ্রীসে। বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত ও নিগৃহীত করার বহু ভয়ঙ্কর কাহিনী তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত আছে।

সাধারণভাবে দিঅনিসাস আঙুরের কুঞ্জ ও মদের দেবতা হিসেবে পরিচিত হলেও, অন্যান্য বহু কিছুর সঙ্গে তিনি জড়িত।

ব্যাপক অর্থে তিনি অরণ্যপ্রকৃতির দেবতা। আঙুরের লতাপাতায় মোড়া দণ্ড (thyrsis) তাঁর একটি প্রতীক। মানুষকে তিনিই প্রথম আঙুরের চাষ শিখিয়েছেন। কিন্তু আঙুরলতা ছাড়াও দেবদারু ও ডুমুর তাঁর প্রিয় গাছ। ফল ও ফুলের তিনি রক্ষক। প্রচুর ফল লাভের জন্য তিনি এথেন্সে পুজো পেতেন। তাঁর অনেক বিশেষণের মধ্যে একটি বিশেষণ হচ্ছে 'ফুটন্ত'।

কিন্তু তিনি মুখ্যত কৃষি ও শস্যের দেবতা। তিনিই নাকি পৃথিবীতে কৃষি-বিদ্যা প্রচার করেন। আগে মানুষ নিজে লাঙল টানত, তিনি গরু দিয়ে লাঙল টানবার কৌশল শেখান। থ্রেসে তাঁর একটি প্রতীক চিহ্ন 'কুলা'—যা দিয়ে শস্য থেকে তুঁষ আলাদা করা হয়। এই 'কুলা'-তেই তাঁর অধিষ্ঠান। পুরাণ মতে, জন্মের পর এই 'কুলা'র উপরেই তাঁকে স্থাপন করা হয়েছিল। কৃষি তথা উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে জড়িত থাকায় তাঁর অপর প্রতীক হয়েছিল 'পুং-লিঙ্গ'।

বিভিন্ন পশুর মধ্যে বৃষ তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তাঁকে শুধু বৃষবাহন বললে ভুল হয়। তিনি নিজেই 'বৃষ-রূপী'। 'বৃষ', 'বৃষ-মুখ', 'বৃষ-শৃঙ্গী', 'বৃষ-পদ' প্রভৃতি তাঁর বিশেষণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে ছাগরূপেও দেখা যায়। বৃষের মতো ছাগও তাঁর প্রিয় পশু। এথেন্সের হারমিওনে তিনি 'কৃষ্ণছাগ-চর্মের-দেবতা' (malanaigis) নামে পূজিত হতেন। সিংহের মতো হিংস্র পশুর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক আছে, কিন্তু বেশী সম্পর্ক চিতা বাঘের সঙ্গে। চিতা বাঘের দল তাঁর রথ টেনে বেড়ায়।

একদল উদ্দাম প্রকৃতির অনুচর প্রায় সবসময়েই দিঅনিসাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। এদের নাম সাতুর (satyr), এরা অর্ধপশু, অর্ধ নর। এদের গায়ে লম্বা চুল, নিম্নাংশ ছাগের মতো। এরা ভীরুস্বভাব ও কামুক প্রকৃতির জীব। কিন্তু সাতুরদের সঙ্গে দিঅনিসাসের সম্পর্ক খুব বেশী প্রাচীন নয়। নাটকের যুগ ব্যতীত পুরাতন যুগের কাহিনীতে সাতুররা অনুপস্থিত। সেলেনি (Seleni)

সান্তর (centaur) প্রভৃতি পৌরাণিক জীবেরা এবং বনদেবতা প্যানও দিঅনিসাসের অনুচর দলভুক্ত। এরা সবাই পুরুষ। নারী অনুচরদের বলা হয় মিনাড। দিঅনিসাসের এক নাম বাক্‌খাস, তাই এদের নাম বাক্‌কাণ্ট বা বাক্‌খাসের উপাসিকা। দিঅনিসাসের উপাসনার সঙ্গে এদেরই সম্পর্ক গভীর। অনুচরী না বলে এদের ভক্ত-উপাসিকাই বলা উচিত।

দিঅনিসাসের আদিম উপাসনা ও পূজা-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আজ বিস্তারিত জানবার উপায় নেই। পরবর্তীকালে বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে রূপটি স্বীকৃত হয়েছিল, তা বিচার করে অনেকেই বলেন যে, তিনি মূল গ্রীসের দেবতা নন। আঙুরের মদে মত্ত হয়ে উদ্দাম নৃত্য, ভয়াবহ রক্তাক্ত ক্রিয়াকলাপ, যৌনমিলন, রহস্যময়তা প্রভৃতি দিঅনিসাসের পূজা-অনুষ্ঠানের লক্ষণ এবং তাঁর কাহিনীর প্রকৃতি থেকেই এই অনুমান করা হয়। বলা হয়, দিঅনিসাস প্রচ্ছন্ন মিশরীয় ওসিরিস (osiris)। কিন্তু এ অনুমান সম্ভবত ভ্রান্ত।

পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই আদিম মানুষের চোখে ধরা পড়েছিল প্রকৃতির পরিবর্তনের রূপটি। একবার শস্যশ্যামল, অন্যবার শস্যহীন পাণ্ডুর, আবার শ্যামল রূপ, আবার পাণ্ডুরতা। শীতের সমাধিগহ্বর থেকে বসন্তে আত্মপ্রকাশ করে তৃণপত্র, প্রখর হয়ে ওঠে সূর্যের তেজ, ফলে ফুলে শস্যে, প্রাণের প্রাচুর্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে পৃথিবী। কিন্তু তারপর আবার শীতের হিমস্পর্শে মৃত্যুর পদসঞ্চার, লুপ্ত হয় তৃণপত্রের শ্যামলিমা, ম্লান হয়ে আসে সূর্য, প্রাণহীন বিষণ্ণ সমাধির মতো পড়ে থাকে পৃথিবী। এইভাবে প্রকৃতির যুগ-যুগান্তের চক্রবৎ পরিবর্তন। প্রকৃতির এই পরিবর্তন, এই শীত ও বসন্তের আবর্তন যেন জন্মমৃত্যুতে আবর্তিত জীবনেরই প্রতিরূপ। আদিম মানুষের চোখে এই পরিবর্তন ও রূপান্তর দেবতার যুগ-যুগান্তের জন্ম, মৃত্যু ও

পুনরুজ্জীবনের আশ্চর্য কাহিনী রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। দেবতার এই মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কাহিনী থেকেই জন্ম ব্যাবিলনের তাম্মুজ, ফিনিসিয়ার অ্যাডোনিস, মিশরের ওসিরিস ও এশিয়া মাইনরের অ্যাটিসের। গ্রীসের মাটিতে দিঅনিসাসের জন্মও এই-ভাবে। এদের সকলের মতোই মৃত্যুর বিলাপ ও পুনরুজ্জীবনের উল্লাস দিঅনিসাসের কাহিনীর ও উপাসনার অঙ্গীভূত।

দিঅনিসাস কৃষি-সম্পর্কিত দেবতা, এইজন্যই হোমারের দেব-গোষ্ঠীতে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত নয়। হোমার ছিলেন অভিজাত রাজন্যবর্গের কীর্তি-কাহিনীর উদ্‌গাতা; যুদ্ধ এবং দেশজয় ছিল সেইসব রাজন্যবর্গের একমাত্র কাজ। কৃষির সঙ্গে তিলমাত্র সম্পর্কও তাদের ছিল না। এদের দেবতারা সকলেই এদের মতোই অভিজাত। অ-কুলীন কৃষি-দেবতা দিঅনিসাস এদের শ্রদ্ধাস্পদ কখনোই হতে পারেন না। দিঅনিসাস শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন গ্রীসের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে। গোত্র (clan) থেকে গোষ্ঠীর (tribe) রূপান্তরের স্তরে স্বাভাবিক নিয়মেই দিঅনি-সাসের পূজা রহস্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল গুহ্য চক্রের (Secret society) মধ্যে। এই গুহ্য চক্রগুলি গঠিত হত নারীদের নিয়ে কারণ, আদিম কৃষি ছিল মুখ্যত নারীর কর্ম। চক্রের পরিচালক হত একজন পুরুষ পুরোহিত। পূজানুষ্ঠান ছিল আভিচারিক। পূজারহস্য বাইরে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল, কেবলমাত্র দীক্ষিতেরাই এই রহস্য জানবার অধিকারী ছিল। দীক্ষিতেরা দেবতার সান্নিধ্য লাভ করে দৈব গুণসম্পন্ন হয়ে উঠত। কৃষি-সংক্রান্ত আদিম ধর্মানুষ্ঠানের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নরবলি এক সময় এই পূজা-অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। এই রহস্যময় পূজা-অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল খুব সম্ভবত দিঅনিসাসের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের রূপায়ণ। দেবতার মৃত্যু রূপায়ণের সময় পুরোহিতকে অথবা বিকল্পে অন্য কোনো কাউকে বলি দেওয়া হত।

পূজারহস্যে দীক্ষিত নারী ভক্তেরা সাধারণত রাত্রিকালে মিলিত হত কোনো পাহাড়ের নিভৃত অংশে, জনবিরল অরণ্যে। সেখানে প্রকৃতির নগ্ন সান্নিধ্যে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তারা মত্ত হয়ে উঠত উদ্দাম নৃত্য ও গীতে। নৃত্য ও গীতের সঙ্গে একটানা বাজত করতাল, আর তার সঙ্গে ফ্রিজিয় বাঁশী। আঙুরের রস আরও মত্ততা বাড়াত। কখনো শান্ত, কখনো প্রচণ্ড উদ্দাম—এই ছিল তাদের প্রকৃতি। নগরের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে গভীর অরণ্যে দিঅনিসাস তাদের অন্ন ও পানীয় যোগাতেন। তারা গাছের ফল আর ছাগের দুধ খেত, ঝরণার জলে স্নান করত, পাতার বিছানায় শুয়ে বাঘের শিশুকে তারা স্তন্য পান করাত। কিন্তু তাদের রূপান্তর ঘটে যেত মুহূর্তের মধ্যে। কোনো শব্দ কানে এলে বা কোনো কিছু চোখে পড়লে ভয়ঙ্কর চিৎকার করতে করতে চামুণ্ডার দল ছুটত সেইদিক লক্ষ করে। এলোচুল উড়ত বাতাসে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাপ জড়ানো থাকত মাথায়), আঙুরলতা আর পাতায় জড়ানো দেবদারুর দণ্ড ঘোরাতে ঘোরাতে প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াত বনে বনে। তখন তাদের গতিরোধ করা ছিল সাধ্যাতীত। তাদের গতিপথে বন্য-জন্তু, মানুষ যা কিছু পড়ত তাকে খালি হাতেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত। তারপর নিহত শিকারের কাঁচা মাংস ও রক্তে ভোজপর্ব শুরু হত। তারা বিশ্বাস করত নিহত শিকার স্বয়ং দিঅনিসাস্। তাঁর মাংস ভোজনে তারা দেবতার ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্য লাভ করছে, দেবতা এর মধ্যে দিয়েই পুনর্জীবন লাভ করবেন, টাইটানরা এই-ভাবেই হত্যা করে তাঁকে অমরত্ব দান করেছিল। এরই সঙ্গে চলত উদ্দাম নৃত্য ও গীত। সারা রাত্রিব্যাপী প্রচণ্ড মত্ততার পর একসময় আবার তারা প্রকৃতিস্থ হত। তখন তারা ঘরে ফিরে আসত দল বেঁধে। এই অদ্ভুত সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠানে যথেচ্ছ যৌনাচার মোটেই অনুপস্থিত ছিল না। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে গুহ্য ব্যাপার ছিল।

দিঅনিসাস-উপাসনায় এই ধরনের আভিচারিক অনুষ্ঠানের নজির রোম সাম্রাজ্যের শেষ যুগ পর্যন্ত পাওয়া গেলেও, সাধারণভাবে গ্রীসে—বিশেষ করে অ্যাটিকায় কিন্তু আভিচারিক রূপটি ক্রমশ অপ্রধান হয়ে পড়েছিল। কৃষির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের যোগ ছিল, তাই এর ব্যাপকতা ছিল কৃষিজীবীদের মধ্যে। কিন্তু কালক্রমে আদিম ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে অনুষ্ঠানটি অনেকটা দূরে সরে এসেছিল। গোত্র ও গোষ্ঠীর রূপান্তরের ফলে গুহ্য চক্রগুলিও প্রায় ভেঙে গিয়েছিল। সমাজে নারীর অবস্থার বিপর্যয় ঘটায় উপাসিকা হবার একমাত্র অধিকারও আর নারীদের বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ফলে, গোটা অনুষ্ঠানই প্রকাশ্য ব্যাপার হয়ে পড়েছিল এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই এতে যোগদান সম্ভব হয়েছিল। এর তিনটি বৈশিষ্ট্য—সমবেতভাবে যাত্রা করে কোনো নদী বা পাহাড়ের কোলে উপস্থিত হওয়া, দেবতার মৃত্যুর বিকল্প হিসাবে পশু বলি দেওয়া এবং পরিশেষে দল বেঁধে ফিরে আসা—চিরদিনই বজায় ছিল। আর এই অনুষ্ঠানের কাহিনী-সম্পর্কিত সংগীত ও অনুকৃতি সম্পন্ন করার ভার ছিল একমাত্র দীক্ষিতদের উপর।

দিঅনিসাসের প্রকাশ্য উৎসব ছিল দুই ধরনের। একটি উৎসব হত বসন্তকালে অপরটি শীতকালে। গ্রীসের গ্রামাঞ্চলের এই দুটি উৎসব থেকে গ্রীক নাটকের জন্ম। এই উৎসবের প্রকৃতি ছিল অনেক সহজ ও সরল। উৎসবের দিন গ্রামের সমস্ত লোকজন শোভাযাত্রা করে দিঅনিসাসের বেদীর কাছে যেত। সেখানে একটি ছাগ বলি দেওয়া হত। শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকত একটি সালঙ্কারা কুমারী, তার মাথায় থাকত একটি ঝুড়িতে নৈবেদ্য, ফুল ও বলিদানের ছুরি। অন্যান্য সকলে নিত আঙুর, ডুমুর, মদ। আর দেবতার প্রতীক

হিসাবে মাথায় করে বয়ে নিতে হত একটি লিঙ্গ। বলিদানের সময় দেবতার উদ্দেশে নৃত্য ও গীত হত। তারপর ভোজ আর আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে দিন শেষ হত। আবার সকলে শোভাযাত্রা করে গ্রামে ফিরে আসত।

শীতকালে যে উৎসব হত, তা থেকে জন্ম কমেডির (comedy) আর ট্রাজিডির (tragedy) জন্ম হত বসন্তকালের উৎসব থেকে। শীতকালের উৎসবে যে শোভাযাত্রা বার হত, তাতে যে-দলটি গান গাইতে গাইতে লিঙ্গটি বয়ে নিয়ে যেত তাদের বলা হত 'কোমাস' (comus)। গানের ফাঁকে ফাঁকে শোভাযাত্রার নেতা নিজে নিজেই অথবা গায়কদের সঙ্গে রঙ্গরস করে সকলের আনন্দ দিত। এই রঙ্গরসের বক্তব্য ছিল মূলত অশ্লীল এবং হাস্যরস প্রধান।

বসন্তকালের উৎসবে দিঅনিসাসের উদ্দেশে যে গান গাওয়া হত, তার নাম দিথুরাম্ব (dithyramb)। দিথুরাম্ব মূলত সমবেত সংগীত। প্লেটোর মতে দিথুরাম্ব শব্দটির অর্থ 'দুই দরজা' (গ্রীক-দিথুরাম্ব = দ্বি দ্বারম্ ?)। কারণ, দিঅনিসাসের জন্ম হয়েছিল দুইবার, একবার মাতৃগর্ভ থেকে, অন্যবার জিউসের উরু থেকে। স্পষ্টতই দিথুরাম্বের বিষয়বস্তু ছিল দিঅনিসাসের জন্মকাহিনী। কিন্তু সমবেত সংগীতের সঙ্গে অর্থবহ অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে সে কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করা হত। দিঅনিসাসের অনুচর সাতুরদের মতো সাজসজ্জা করে বেদীর চারপাশে সবাই মিলে ঘটনার বাস্তব অনুকরণ করত। বাস্তবের এই যে অনুকৃতি, নাটক সৃষ্টির পক্ষে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

দিথুরাম্ব বহুকাল পর্যন্ত লোককৃষ্টির পর্যায়ে পড়েছিল। কিন্তু থিবি, করিন্থ, নেক্সস প্রভৃতি অঞ্চলে দিথুরাম্বের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক গড়ে উঠেছিল। এর সাহিত্যিক কৌলিন্য ঘটে অনেক পরে।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক আগেই গ্রীসের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোয় একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল। ভূমি-

আশ্রয়ী অভিজাত শ্রেণীকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল গ্রীসের নতুন বণিকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর সংঘর্ষের ফলে প্রথম যুগের স্বৈরাচারী নায়কদের (tyrant) আবির্ভাব। ক্ষমতা করায়ত্ত করে নতুন ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে ধর্মসংস্কারের প্রতিও তাদের দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিরোধ চূর্ণ করতে গিয়ে ধর্মের উপর তাদের কর্তৃত্বকেও আঘাত করতে হয়েছিল। কারণ, প্রচলিত ধর্ম ছিল অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা রক্ষার অন্যতম আয়ুধ। এই অভিজাত শ্রেণীর ধর্মকে শক্তিহীন করার জন্য তারা তাই অন্যান্য শ্রেণীর—যে সকল শ্রেণীর তারা প্রতিনিধিত্ব করত—ধর্মানুষ্ঠানকে বিশেষ উৎসাহ ও অনুমোদন দিয়েছিল। এইভাবেই মূলত কৃষিজীবীদের দেবতা প্রাচীন দিঅনিসাস করিন্থ, এথেন্স ও সাইকিঅনে রাষ্ট্রের অনুমোদিত দেব-গোষ্ঠীতে স্থান লাভ করেন, এইভাবেই গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে তিনি নাগরিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হন।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে করিন্থের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করেন পেরিঅনদার। তিনিই লেসবসের কবি আরিঅনের পৃষ্ঠপোষক। হেরোদোতাসের মতে কবি আরিঅনই দিথুরাম্বের প্রবর্তক। অবশ্য তাঁর আগে দিথুরাম্ব রচনার একটি ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। পুরাতন দিথুরাম্বকে সংস্কার করে তিনি একটি বিশিষ্ট রূপ দান করেন। তাঁর দিথুরাম্বের প্রকৃতি কি ছিল, তা আজ বিস্তারিত জানবার কোনো উপায় নেই। সম্ভবত শোভাযাত্রার পরিচালক একটি করে পদ গাইত আর কোরাস তার ধুয়ো ধরত। আরিঅন কোরাসের সংখ্যা পঞ্চাশজনে নির্দিষ্ট করে দেন। নাটক সৃষ্টির দিক থেকে তাঁর পরিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে গানের মাঝে মাঝে আবৃত্তির যোজনা। দিথুরাম্বের পরিচালককে সাধারণত একটা ছোট মঞ্চের উপরে উঠে কোরাসের সঙ্গে পদ্যে কথোপকথন

করতে হত। এই কথোপকথনের বিষয়বস্তু ছিল দিঅনিসাসের জীবনের ঘটনাবলী। এর মধ্যে দিয়ে গানের বক্তব্যও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হত। এইজন্যই আরিস্টটল বলেছেন, গ্রীক ট্রাজিডির বীজ ছিল দিথুরাম্বের পরিচালকের কথোপকথনের মধ্যে। কিন্তু দিথুরাম্বের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক কিছু ছিল যা ট্রাজিক রসের বিরোধী। কালক্রমে বিরুদ্ধ রসবস্তু বর্জিত হয়ে ট্রাজেডির জন্ম হয় অখণ্ড রস-সত্তা নিয়ে।

আরিঅনের আগে ট্রাজিডি কথাটির উৎপত্তি হয় নি। আরিঅনকেই ট্রাজিক রীতির প্রবর্তক বলে স্বীকার করা হয়। তিনি ও তাঁর সমধর্মী দিথুরাম্বের কবিরা ট্রাজিক কবি নামে খ্যাত, তাঁদের রচনাকেও বলা হত ট্রাজিডি। পরবর্তীকালে ট্রাজিডির সংজ্ঞা অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী অবশ্য আরিঅন প্রভৃতিদের রচনাকে কখনোই ট্রাজিডি বলা যায় না।

সাধারণভাবে ট্রাজিডি কথাটির অর্থ 'ছাগ-সংগীত' (tragoedeia) উৎসবে যে ছাগ বলি দেওয়া হত, অথবা কৃতি-কবিকে যে ছাগ উপহার দেওয়া হত, সম্ভবত তা থেকেই কথাটির উৎপত্তি। অন্য মতে, সাতুরদের দেহের নিম্নাংশ ছিল ছাগের মতো, তাই সাধারণভাবে তাদের বলা হত 'ছাগ'। দিথুরাম্বের নায়কদেরও সাজসজ্জা হত সাতুরদের মতো, তাদের গানকে বলা হত 'সাতুরদের গান'। এই সাতুর অথবা 'ছাগের গান' থেকে ট্রাজিডি কথাটির উৎপত্তি; কিন্তু পরবর্তীকালে ট্রাজিডি কথাটির অর্থ যে কেবল ছাগের সঙ্গেই সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দিথুরাম্বের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ছিল বৃষ, কিন্তু ট্রাজিডির পুরস্কার ছিল একটি ছাগ। সেই দিক থেকে tragoedeia অর্থাৎ 'ছাগ-সংগীত' নামকরণ একান্ত স্বাভাবিক।

আরিঅনের পরবর্তীকালে দিথুরাম্বে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কাব্যে পরিণত হয়েছিল দিথুরাম্বের ছিল দুটি শাখা—একটি সংগীতমূলক, অপরটি নাট্যমূলক। উন্নত ডোরিক গীতিকাব্যের প্রভাবে প্রথম শাখাটি পিলোপনোশিয়ার সর্বত্র বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। প্রকৃত দিথুরাম্ব বলতে এই সংগীতমূলক প্রথম শাখাটিকে বোঝায়। ট্রাজিডির বিবর্তনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। পরবর্তীকালে দিঅনিসাসের কাহিনী ছাড়া অন্য কাহিনীও দিথুরাম্বের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হত। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে লেসাস্ এর বহু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। বিভিন্ন উৎসবে এই দিথুরাম্বের প্রতিযোগিতা হত। খ্রীঃ পূঃ ৫০৮ অব্দ থেকে এথেন্সে এই প্রতিযোগিতার সংবাদ পাওয়া যায়। দিথুরাম্বের চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছিল পিন্দার ও সিমোনিদাসের হাতে। কিন্তু তাঁদের পর এর অবনতি ঘটে। পরিণত ট্রাজিডির প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে দিথুরাম্বের প্রতিযোগিতাও এথেন্সের দিঅনিসাসের বাৎসরিক উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল।

দিথুরাম্বের নাট্যমূলক শাখার বিবর্তিত রূপ ট্রাজিডি। ট্রাজিডি-সৃষ্টির সম্পূর্ণ গৌরব এথেন্সের প্রাপ্য।

নির্দেশিকা

দিঅনিসাসের উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পক্ষে সহজ লভ্য ভালো বই হচ্ছে: জেমস জি. ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাও', দুই খণ্ড (ম্যাকমিলান); ইউরিপিদিসের 'বাক্থাই' নাটক (পেংগুইন); মারি রেনোর 'দি কিং ইজ ডেড্' (পকেট বুক)।

দিঅনিসাসের উৎসব ও নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে: জর্জ টমসনের 'ইস্কাইলাস অ্যাণ্ড এথেন্স' (লরেন্স অ্যাণ্ড উইসহার্ট)।

প্রাথমিক যুগের গ্রীক নাটক সম্পর্কে ভালো বই: রিজওয়ের 'অরিজিন অব গ্রীক ট্রাজিডি; হেইগের 'দি ট্রাজিক ড্রামা অব দি গ্রীকস্', 'অ্যাটিক থিয়েটার'। এইচ জি. এফ. কিটোর 'গ্রীক ট্রাজিডি।'

গ্রীক ট্রাজিডির বিবর্তন

গ্রীক ট্রাজিডির প্রতিষ্ঠাতা কবি থেসপিস। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে ম্যারাথনের কাছে আইকেরিয়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মস্থান ছিল দিঅনিসাস পূজার অন্যতম উৎস। ধারেকাছের অঞ্চলগুলিতেও এই পূজার ব্যাপকতা ছিল। গ্রীসের অন্যান্য প্রদেশগুলি থেকে এখানকার বসন্ত ও শীতোৎসবের আড়ম্বর ও ঘটা ছিল অনেক বেশি। থেসপিস এখানকার ধর্মীয় ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই প্রথম দিথুরাম্বের কাঠামো পরিবর্তন করে এক নট বা অভিনেতার অংশযোজনা করেন।

এই পরিবর্তন অতি সহজ ও সামান্য হলেও নাটকের দিক থেকে অসাধারণ মূল্যবান। এই নতুন প্রবর্তিত নট ঠিক আর আগের মতো কোরাসের পরিচালক রইল না। আগেকার বিবৃতিমূলক সংলাপ অথবা কোরাসের সংগীতের ব্যাখ্যানের জায়গায় এখন এই নটের কাজ হল ঘটনার মূল পাত্র বা পাত্রী হিসাবে নিজেই ঘটনাটি রূপায়িত করা। আগে দলবল নিয়ে সবাই সাজত সাতুরদের সাজে। সেখানে পরিচালকের সংলাপ থাকলেও সে-সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত বিবৃতিমূলক, ঘটনার পরোক্ষ বিবরণ। কিন্তু এখন নট নিজে হয়ে দাঁড়াল ঘটনার মূল চরিত্রগুলির রূপকর্তা। সে কখনো দেবতা দিঅনিসাস, কখনো বা রাজা, আবার কখনো সন্দেশবহ। এইভাবে ঘটনার রূপায়ণে একটা অভিনবত্বের সৃষ্টি হল, জিনিসটা এখন আর বিবৃতিমূলক না হয়ে নাটকীয় গতিসম্পন্ন হয়ে উঠল।

নট বা অভিনেতার গ্রীক প্রতিশব্দ 'হুপেক্রেতে', যার অর্থ

-ব্যাখ্যাকার। দিথুরাম্বের বিষয়বস্তু ছিল দিঅনিসাসের জন্ম ও মৃত্যু-কাহিনী। যারা কোরাসে অংশ নিত, তারা সবাই ছিল দীক্ষিত। কোরাসের সংগঠনটি ছিল প্রাচীন গোপন সঙ্ঘেরই বিবর্তিত রূপ। সমস্ত কিছুই একসময় ছিল গোপন অনুষ্ঠান। এখন সাধারণের সামনে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিল। যারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে দেবতার মৃত্যুকাহিনী রূপায়িত করতো তারা কোরাসের নৃত্য ও নাট্যের অর্থ জানতো, কিন্তু সাধারণ দর্শক জানতো না। এইজন্যই কাহিনী বিবৃতির কোনো এক বিশেষ অংশে পরিচালককে উঠে পূর্বাপর বিবৃত করে বলতে হতো: আমিই জেউস-সেমেলের পুত্র দিঅনিসাস ইত্যাদি। যারা অদীক্ষিত তাদের কাহিনী ও ঘটনা বুঝিয়ে দিতে হতো। ব্যাখ্যা করার এই প্রয়োজন থেকেই নট বা অভিনেতার উৎপত্তি। আর এইভাবেই গোপনসঙ্ঘের প্রাচীন পুরোহিত পরবর্তীকালের দিথুরাম্বের কবি ও পরিচালকে রূপান্তরিত হয়েছিল, এইভাবেই সে এখন হল নট বা অভিনেতা। প্রথমে পুরোহিত, তারপর পরিচালক-কবি, সর্বশেষে অভিনেতা—এইভাবে বিবর্তন সম্পূর্ণ হল। অপর দিকে দীক্ষিতদের নিয়ে গঠিত গোপনসঙ্ঘ রূপান্তরিত হল কোরাসে। এরই ফলে, প্রথমে ধর্ম ও পরে বৃত্তি ও জীবিকার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল অভিনেতাদের গিল্ড বা সংগঠন।

প্রাচীন যুগের সমস্ত নাট্যকারদের মতো থেসপিস নিজেই নটের অংশ নিতেন। বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণায় বার বার তাঁকে অঙ্গসজ্জা পরিবর্তন করতে হতো। তিনি মুখে মাখতেন সফেদা অথবা ন'টা মনির (purslane) রং। পরে তিনি কাপড়ের মুখোশের প্রবর্তন করেন।

থেসপিস এথেন্স এবং বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নিজের নাটক প্রদর্শন করতেন। খোলা জায়গায় সমবেত দর্শকদের সামনে এই নাটকের অভিনয় হতো। আগেকার কোরাসের পরিচালকের মঞ্চ নতুন নটের

পক্ষে সুবিধাজনক হল। মঞ্চ থেকে একটু দূরে একটি ঘর হল মুখোশ আর পোষাক পালটাবার জায়গা। এই ঘরকে গ্রীক ভাষায় বলা হতো 'স্কেনে' (skene) অর্থাৎ 'তাঁবু', অপর একটি অর্থ 'ঢাকা গাড়ি'। থেসপিস গাড়িতে তাঁর দলবল নিয়ে অ্যাটিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে নাটক দেখিয়ে বেড়াতেন। 'কোমাসের' শোভাযাত্রাতেও গাড়ির ব্যবহার আবশ্যিক ছিল। এই 'স্কেনে' মঞ্চের পিছনে থাকতো এবং মঞ্চের পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এ থেকেই আধুনিক 'সিন' (scene) কথাটির উৎপত্তি।

নট 'স্কেনে' থেকে বেরিয়ে প্রথমে উঠতো মঞ্চে, এক দীর্ঘ বক্তৃতায় বলে দিত ঘটনার বিষয়বস্তু। এরই নাম 'প্রোলোগ'। এরপর শুরু হতো কোরাসের সংগীত। এই সংগীতের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের বেশে নট ঢুকতো। নিজে নিজেই অথবা কোরাসের পরিচালকের সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘটনার নাটকীয় রূপায়ণ সম্ভব করে তুলতো। অবশ্য বিবৃতি ও সংলাপগুলি প্রথমে খুবই দীর্ঘ হতো। অনেকে বলেন, থেসপিস দিঅনিসাসের কাহিনী ছাড়াও অন্যান্য কাহিনীও নাটকের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

করিন্থের মতোই 'টাইরাণ্ট' পিসিস্ত্রাতোসের আমলে দিঅনিসাসের উৎসব এথেন্সে রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে। এথেন্সে দিঅনিসাসের মন্দির স্থাপিত হয়। থেসপিস অনেক আগে থেকেই আইকেরিয়ায় নাটক প্রদর্শন করতেন। সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তিনি এথেন্সেও নাটক প্রদর্শন শুরু করেন। কিন্তু সম্ভবত তখনো নাটক প্রদশন দিঅনিসাসের উৎসবের আবশ্যিক কর্মসূচী হিসাবে রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করে নি। গল্প আছে, একবার তাঁর অভিনয়ের সময় সোলোন উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিল্পের এই নতুন রূপটিকে মোটেই পছন্দ করেন নি। কোনো দেবতা বা মানুষের চরিত্রের রূপায়ণ তাঁর কাছে মানুষের চোখে ধুলো দেবার সামিল বলে মনে হয়েছিল। থেসপিসকে এই কথা বলায়, তিনি

উত্তর দিয়েছিলেন : এ শুধু আনন্দদানের জন্য, এতে কারুর ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সোলোন নাকি জোর গলায় বলেছিলেন : খুবই তাড়াতাড়ি এই চোখে ধুলো দেবার আর্ট সাধারণ স্তরে ছড়িয়ে পড়বে। এরই কিছুকাল পরে, পিসিস্ত্রাতোস নিজের গায়ে মিথ্যে ক্ষত সৃষ্টি করে আহত হবার ভান করে, এথেন্সের নাগরিকদের কাছ থেকে তাঁর দেহরক্ষী নিয়োগের দাবি সমর্থন করিয়ে নেন, আর তার ফলেই তাঁর স্বৈরাচার স্থায়ী করে নিতে সমর্থ হন। সোলোনের নাকি শেষ পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পিসিস্ত্রাতোসের এই ভণ্ডামী থেসপিসের কু-দৃষ্টান্তেরই ফল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ভণ্ড কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'হিপোক্রিট্' গ্রীক 'হুপোক্রেতে'র তদ্ভব রূপ।

পিসিস্ত্রাতোসের ব্যক্তিগত চরিত্র যাই হোক না কেন, তিনিই প্রথম দিঅনিসাসের উৎসবে সরকারীভাবে নাটকের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনের প্রবর্তন করেন। রাজনৈতিক কারণে আইকেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের কৃষিজীবীদের পক্ষ সমর্থন করা পিসিস্ত্রাতোসের প্রয়োজন ছিল, তাদের দেবতা দিঅনিসাসকে তিনি তাই এথেন্সে প্রতিষ্ঠিত করে আড়ম্বরপূর্ণ নগর-দিঅনিসিয়া উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর সময়েই জেউস ও আপেলোর নতুন মন্দির গড়ে ওঠে, পানাথেনিয়া নবরূপে সংগঠিত হয়। বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার, রাষ্ট্র ও সমাজের পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনিই হোমারের মহাকাব্যের সম্পাদনার ব্যবস্থা করেন এবং নিয়মিত মহাকাব্য আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। নানাভাবে অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক মান উন্নয়নের ফলে তাঁর সময়ে এথেন্স প্রসারমূলক এক নতুন জাতিগত প্রেরণা লাভ করে। ৫৩৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বিজয়ী পিসিস্ত্রাতোস তৃতীয় বার এথেন্সে প্রবেশ করেন, সেই বছরেই নগর দিঅনিসিয়াতে প্রথম নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। থেসপিস এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই বছরটি থেসপিসের জীবনে তো বটেই মানুষের শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসেও চিরস্মরণীয়। এই প্রথম শিল্প

সৃষ্টি একটি রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন লাভ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি আর কখনো ঘটে নি।

থেসপিসের পর বাৎসরিক নাটক প্রতিযোগিতায় বহু নাট্যকারই যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কোয়েরিলাস, প্লাতিনাস আর ফ্রানিকাস ছাড়া অন্য কারুর নাম পাওয়া যায় না। এঁরা সবাই খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর লোক। ট্রাজিডির বিবর্তনে এঁদের প্রত্যেকরই কিছু কিছু দান আছে। এই তিন জনের মধ্যে ফ্রানিকাসের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক।

খ্রীঃ পূঃ ৫২৩ অব্দ থেকে কোয়েরিলাস নাটক প্রদর্শন শুরু করেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৯ অব্দে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তরুণ ইস্কাইলাস। শোনা যায়, তাঁকে সোফোক্লিসের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। তিনি নাটক লিখেছিলেন একশো ষাটখানা, জয়লাভ করেছিলেন তেরো বার। কিন্তু তাঁর একটি নাটকও পাওয়া যায় নি। অভিনয়ের মুখোশ এবং সাজসজ্জার কিছু কিছু পরিবর্তন তিনি করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

প্লাতিনাসের প্রসিদ্ধি মুখ্যত সাতুর-নাটকের (satyric drama) প্রবর্তক হিসাবে। দিঅনিসাসের জীবনকাহিনী উৎসবের নাটকগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু হলেও, থেসপিসের সময় থেকেই ক্রমশ বিভিন্ন বিষয়বস্তু স্থান পেতে আরম্ভ করেছিল। দিঅনিসাসের জীবনকাহিনীর কিছু কিছু অংশ বাদ পড়ে যেতো. সে কাহিনীগুলি ট্রাজিডির রসের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। কিন্তু দর্শকদের কাছে কাহিনীগুলি বাদ দেওয়াটা দেবতার মর্যাদাহানিকর বলে মনে হতো। তাদের দাবি মেটাতেই প্লাতিনাস ট্রাজিডি আর দিথুরাম্ব মিলিয়ে নতুন ধরনের এই নাটক প্রবর্তন করেন এবং এই নাটকপ্রদর্শন উৎসবের কর্মসূচীতে আবশ্যিক বলে গণ্য হয়। প্লাতিনাস আঠারোখানি ট্রাজিডি ও বত্রিশখানি সাতুর-নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকও একখানিও পাওয়া যায় নি।

ফ্রানিকাস প্রথম জয়লাভ করেন খ্রীঃ পূঃ ৫১১ অব্দে। খ্রীঃ পূঃ ৪৭৬ অব্দে তিনি যেবার জয়ী হন, সেবার থেমিস্তোক্লিস কোরাসের নায়ক হিসাবে মঞ্চে নেমেছিলেন। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র। তিনিই প্রথম সমসাময়িক ইতিহাসকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এটি তাঁর অসীম সাহসের পরিচয়। আইওনিক বিদ্রোহ নিয়ে তিনি যে ট্রাজিডি লিখেছিলেন তাতে এথেন্সবাসীরা অভিভূত হলেও তাঁকে এক হাজার দ্রাখ্মা জরিমানা করেছিল এবং নাটকটির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কারণ, এই বিদ্রোহ ছিল এথেন্সের কাছে লজ্জা ও কলঙ্কের ঘটনা। তিনি এরপর পারস্যযুদ্ধ নিয়ে লেখেন ফোনিসাই। এই নাটকটির ভাগ্য ভালো ছিল, কারণ এতে গ্রীকদের বিজয়কাহিনীই বর্ণিত হয়েছিল।

নাটকের অভিনয়ে ফ্রানিকাস কোরাসের নাচের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনিই প্রথম নারীচরিত্রের মুখোশের প্রবর্তন করেন। জীবদ্দশায় ফ্রানিকাস প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁরও কোনো নাটক পাওয়া যায় নি।

এঁদের পর গ্রীক নাট্যজগতে ইস্কাইলাসের আবির্ভাব। ইস্কাইলাস শুধু গ্রীসের নন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। গ্রীক ট্রাজিডিকে তিনিই প্রথম ভাব ও রূপের লৌহবন্ধনে সুনির্দিষ্ট করেন। এর আগের নাটকগুলিতে গান ও সংলাপের মধ্যে ঘটনার যে নাট্যরূপ ছিল, তা অত্যন্ত স্থূল এবং শিথিলবন্ধ। গ্রীক ট্রাজিডির গম্ভীর ভাবোদ্দীপক রস ব্যঞ্জনার অভাব তাদের মধ্যে ছিল। ইস্কাইলাস নাটকের বিষয়বস্তু ও বহিরঙ্গের বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করে যে নাটক সৃষ্টি করেন, চিরদিনের জন্য তাই মুখ্যত গ্রীক ট্রাজিডির খাঁটি রূপ বলে স্বীকৃত হয়ে আছে।

নাটকের সবচেয়ে বড় কথা যে নাটকীয় গতি, তা দ্বন্দ্ব ছাড়া

কখনো সম্ভব হয় না। পাত্রপাত্রীর ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধতা অথবা দ্বন্দ্বই নাটককে গতিমান করে তোলে। নাটকের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বের সাফল্যজনক প্রবর্তনই ইস্কাইলাসের অন্যতম কৃতিত্ব। এই দ্বন্দ্ব ফোটাতে একাধিক পাত্র অথবা পাত্রীর প্রয়োজন। কিন্তু গ্রীক নাটকে থেসপিসের পরেও একটিমাত্র নট ছিল। ফলে ঘটনার নাট্যরূপের চূড়ান্ত পর্যায় সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল। এই ত্রুটি সংশোধন করে ইস্কাইলাস প্রবর্তন করেন একটির বদলে দুটি নট। এর ফল হল যুগান্তকারী। এখন ঘটনার চূড়ান্ত রূপ ফোটাতে দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করানো সম্ভব হল। আর দুজন নটের ফলে কোরাসের বিবৃতিমূলক অংশের দৈর্ঘ্যও কমে গেল, কোরাসের ভূমিকা অপ্রধান হয়ে মঞ্চের নটেরাই প্রধান হয়ে উঠল।

ইস্কাইলাসের জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে। গ্রীক দেবী দিমিতারের পূজার জন্য বিখ্যাত পীঠ ইলিউসিস তাঁর জন্মস্থান। এখানে তাঁর শৈশব কেটেছে দিমিতারের উৎসব, পূজা ও ধর্মের রহস্যময় আবেষ্টনীতে। অতি অল্পবয়সেই তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৯ অব্দে তিনি প্রথম প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। এই বছরটি স্মরণীয় এই কারণে যে, এই বছরে দর্শকদের বসবার মঞ্চটি ভেঙে পড়ে এবং তার ফলে পরে একটি পাথরের মঞ্চ গড়ে তোলা হয়।

খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪ অব্দে ইস্কাইলাস প্রথম পুরস্কার লাভ করেন এবং পরবর্তী আঠাশ বছরে প্রতিযোগিতায় প্রায় তেরো বার জয়লাভ করেন। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দে প্রথম পরাজিত হন তরুণ নাট্যকার সোফোক্লিসের কাছে। তরুণ সোফোক্লিসের কাছে প্রবীণ ও সর্বজনমান্য ইস্কাইলাসের পরাজয় সেদিন এথেন্সে অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

অন্যান্য গ্রীক নাট্যকারদের মতো ইস্কাইলাস নিজেই তাঁর নাটকের প্রধান অভিনেতা ও মঞ্চপরিচালক ছিলেন। নিছক অভিনয়ের দিক থেকেও তিনি কিছু কিছু অভিনবত্বের প্রবর্তক। ট্রাজিডির

বিষয়বস্তু অনুযায়ী অভিনেতাদের সাজপোষাকের গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি নতুন ধরনের সাজপোষাকের সৃষ্টি করেন। তাঁর ট্রাজিডির পাত্রপাত্রী সাধারণত পুরাণকথার বীরবৃন্দ অথবা আপোলো, প্রমিথিউসের মতো দেবতারা। ভাবের দিক থেকে তাঁর ট্রাজিডি মহান গম্ভীর, বিশাল তার ব্যাপ্তি, বিরাট তার পরিকল্পনা; তাতে স্বর্গ-মর্ত মন্থন করা আলোড়ন, দেব-মানব-স্থাবর-জঙ্গমের ভবিতব্যের নির্দেশ। এমন ট্রাজিডির রস ফোটানো সহজসাধ্য নয়। এইজন্য অনুকূল ভাবসৃষ্টির জন্য অভিনেতাদের সাজসজ্জাকেও বিস্ময়কর করে তুলতে হল। দেহে ও আকারে বিরাটত্বের ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি কাঠের কৃত্রিম উঁচু উঁচু জুতোর (cothurnus) ব্যবহার প্রবর্তন করেন; পোষাক হয় কারুকার্যময়, বিচিত্র বর্ণে ঝলমল, মুখোশগুলি বিস্ময়কর। রঙীন দৃশ্যপট তিনি ব্যবহার করতেন কি না, তা জানা যায় না। কিন্তু মঞ্চসজ্জার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। নাটকে উল্লিখিত বহু জিনিস দিয়ে তিনি মঞ্চ সাজাতেন। অনেকের মতে, তিনি নানারকম যন্ত্রের সাহায্যও নিতেন। ক্রেনের মতো যন্ত্রের সাহায্যে অভিনেতাদের শূন্যে তুলে ঊর্ধ্বলোকের ভ্রান্তি সৃষ্টি করতেন, স্বর্গে দেবতাদের দেখাতেন, যন্ত্রের সাহায্যেই রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের দৃশ্য প্রভৃতি দেখানো হতো।

এখানে গ্রীক ট্রাজিডির 'ত্রয়ী' বা triology কথার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এথেন্সের নাটক প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক কবিকে চারখানি করে নাটক দিতে হতো। তিনখানি ট্রাজিডি এবং একখানি সাতুর-নাটক। এই প্রথম তিনখানি নাটকের বিষয়বস্তু প্রথম দিকে অসম্বদ্ধ ছিল। কিন্তু ইস্কাইলাস তিনখানিকে একই কাহিনীর ক্রমপরিণতি হিসাবে নাট্যরূপ দেন। এতে একটা সুবিধা হল এই যে, নাটকের বিষয়বস্তুকে পরিসরের সংকীর্ণতা থেকে ক্রমশ বৃহত্তর পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে নাট্যোচিত সুষ্ঠুরূপ দেওয়া যায়। যেমন, তাঁর অরেস্তিয়া-ত্রয়ী। এর মধ্যে আছে তিনখানি নাটক—

আগামেম্‌নন, কোয়েফোরোয় আর ইউমেনিদেস। ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে আগামেম্‌ননের আরগসে প্রত্যাবর্তন, স্ত্রী ক্লাইতেমনেস্ত্রার হাতে তার মৃত্যু এবং ক্লাইতেমনেস্ত্রার উপপতি এজিসথাস কর্তৃক সিংহাসন অধিকার পর্যন্ত আগামেম্‌ননের কাহিনী ; কোয়েফোরোয়-এর কাহিনী অরেস্তিয়ার প্রত্যাবর্তন, মাতৃহত্যা এবং মাতৃকাগণ কর্তৃক তার পশ্চাদ্ধাবন পর্যন্ত ; আর দেলাফিতে আপোলোর মন্দিরে অরেস্তিয়ার আশ্রয় গ্রহণ, বিচার, সর্বশেষে মুক্তি এবং মাতৃকাগণের সন্তোষেই ইউমেনিদেসের কাহিনীর সমাপ্তি। এই তিনখানি নাটকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অল্প। প্রথম দুখানির মধ্যে দশ বছর, শেষের দুখানির মধ্যে কয়েক মাস। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কাহিনী ও সময়ের ঐক্য ব্যাপক অর্থে এদের মধ্যে অক্ষুণ্ণই আছে। পৃথক হলেও এরা যেন একই নাটকের তিনটি অঙ্ক।

এথেন্সের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় যুগে ইস্কাইলাসের আবির্ভাব। মারাথন, সালামিস ও প্লাটিয়ার যুদ্ধে ভুবনবিজয়ী পারস্য শক্তি চিরকালের জন্য চূর্ণ হয়েছে। অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, আতঙ্কের দিন শেষ হয়েছে। দেশজুড়ে নতুন উদ্দীপনা। নির্বুদ্ধিতার জন্য পারস্যযুদ্ধে স্পার্টা তার নেতৃত্ব হারিয়েছে। সমগ্র গ্রীকভূমির একচ্ছত্র নেতা এথেন্স। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে নতুন নগরী। তাকে নিজের হাতে দেবমূর্তি দিয়ে সাজিয়েছেন ভাস্কর ফিদিয়াস। বিশাল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন পেরিক্লিস। সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য ও বাহুবলে এথেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই। অলিম্পিক প্রতি-যোগিতা সত্যিকারের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়েছে, দিকে দিকে উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। আশা উদ্দীপনা আর অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী এথেন্স। এথেন্সের চোখে পৃথিবী এক বিরাট বিস্ময়, মানুষের জীবন অতল রহস্যময়, অফুরন্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত, সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো অশান্ত উদ্দাম। ইতিহাসে এমন গৌরবের যুগ খুব কমই এসেছে।

এথেন্সের এই গৌরবের অনেকখানি অংশীদার ছিলেন ইস্কাইলাস স্বয়ং। শুধু শিল্পে নয়, ব্যক্তিগত শৌর্যে ও বীর্যে তিনি নতুন এথেন্সের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। পারস্যযুদ্ধে বারংবার তিনি দেশ-রক্ষায় অস্ত্র ধরেছিলেন। মারাথনের যুদ্ধে তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাইনেগেরিয়াস যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন প্রাচীরচিত্রে তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে। * আর্টেমিসিয়াস, সালামিস, প্লাটিয়ার প্রায় প্রতিটি রণক্ষেত্রে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সালামিসের বিস্ময়কর নৌ-যুদ্ধের তিনি চাক্ষুষ দ্রষ্টা। মারাথন ও সালামিস-বিজয়ী ইস্কাইলাস দেশরক্ষার সৈনিকের গৌরব কোনদিনই ভোলেন নি। তাই তিনি নিজের যে মৃত্যু স্মরণিকা লিখেছিলেন, তাতে পরিচয় দিয়েছেন কেবলমাত্র সৈনিক আর এথেন্সের নাগরিক হিসাবে। স্মরণিকাটি এই :

> "এথেন্সের নাগরিক ইউফোরিয়ানের পুত্র ইস্কাইলাস মৃত। গেলার শস্যক্ষেত্রে সমাধি তাকে আবৃত করে রেখেছে। তার মহান শৌর্যের কাহিনী বলতে পারে মারাথনের পবিত্র প্রান্তর, এবং দীর্ঘকেশ পারসিকরা তার কোন সংবাদই জানতো না।"

ইস্কাইলাস প্রায় নব্বইখানি নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যে মাত্র সাতখানি বেঁচে আছে। সৌভাগ্যবশত এই সাতখানির মধ্যে আছে তাঁর বিখ্যাত অরেস্তিয়া-ত্রয়ী এবং বন্দী প্রমিথিউস। এই সাতখানিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন হিসাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য মনোনীত হয়েছিল। এদের অসংখ্য টীকাসম্বলিত অনুলিপিও পাওয়া গিয়েছে। এই মনোনয়ন সম্ভবত খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই হয়েছিল, বাইজাণ্টাইন যুগে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল তিনে।

নাটকগুলির মধ্যে সাপলিস, সেপ্তেম, পার্সি এবং প্রমিথিউস ত্রয়ীর খণ্ডিতাংশ। পেরসায় ছাড়া সমস্ত কাহিনীই গ্রীক পুরাণ থেকে

নেওয়া হয়েছে। এজিপতাসের বিবাহেচ্ছু পুত্রদের হাত থেকে কন্যাদের বাঁচাবার জন্য আরগলিসের রাজা পেলাগসের কাছে রাজা দানাউসের আশ্রয়ভিক্ষাই সাপলিস নাটকের কাহিনীবস্তু। এটি ত্রয়ীর প্রথম খণ্ড। সেপ্তেমের কাহিনী থিবির অভিশপ্ত বংশের ভ্রাতৃবিরোধের পরবর্তী কাহিনী। এটি ত্রয়ীর তৃতীয় খণ্ড, অভিনীত হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৪৬৭ অব্দে। পেরসায়-এর কাহিনী ঐতিহাসিক। প্লাটিয়ার যুদ্ধের মাত্র সাত বছর পরে খ্রীঃ পূঃ ৪৭১ অব্দে এটি অভিনীত হয়েছিল। নাটকের ঘটনাস্থল জারাক্সেসের রাজধানী সুসা, পাত্র-পাত্রী সবাই পারসিক। যুদ্ধে জারাক্সেসের পরাজয়, পরাজয়ের কারণ ও প্রতিক্রিয়াই এই নাটকের বিষয়বস্তু। এটি ত্রয়ীর দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রমিথিউস ত্রয়ীর প্রথম খণ্ড। হোমার প্রমিথিউসের কোনো উল্লেখ করেন নি, প্রমিথিউসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন হেসিওদা। তাঁর মতে, মানুষের দুঃখদুর্দশার মূলে হচ্ছেন প্রমিথিউস। এমন একসময় ছিল, যখন মানুষ সুখে বাস করতো, রোগ শোক দুঃখ বেদনার লেশমাত্র সংসারে ছিল না। বিনা শ্রমে বিনা কর্ষণে ফসল ফলতো, মানুষ একত্রে ভোগ করতো। তখন মানুষ আগুনের ব্যবহার জানতো। কিন্তু দেবতাদের ভোজসভায় প্রমিথিউস জেউসকে ভোজ্যের বিশিষ্ট অংশ থেকে বঞ্চিত করায় ক্রুদ্ধ জেউস মানুষের কাছ থেকে আগুনের অধিকার কেড়ে নিলেন। সেই আগুন চুরি করে প্রমিথিউস আবার তা দিলেন মানুষকে। জেউস প্রমিথিউসকে এক পাহাড়ের গুহায় শৃঙ্খলিত করে রাখলেন। প্রতিদিন এক শকুনি এসে প্রমিথিউসের যকৃত ছিঁড়ে খেতো। অবশেষে বীর হেরাক্লিস এসে তাঁকে মুক্তি দিলেন। মানুষের অধিকার অবশ্য মানুষের হাতেই রইল। কিন্তু দেবতাদের চক্রান্তে মানুষের ভাগ্যে জুটল পানদোরা আর তার পেটিকা, যা থেকে সংসারে এল রোগ শোক, মহামারী। হেসিওডের মতে, প্রামিথিউস দেবতাদের ক্রুদ্ধ না করলে মানুষ সুখে থাকতে পারতো, একদিনের শ্রমেই বৎসরের অন্নসংস্থান হতো।

হেসিওদের এই কাহিনী ইস্কাইলাসের কাহিনী থেকে অনেক পৃথক। ইস্কাইলাস কাহিনীকে যুগোপযোগী আদর্শের ছাঁচে নতুন করে গড়ে তুলেছেন। প্রমিথিউসের অবাধ্যতার অন্যায় স্বীকার করে নিলেও তিনি তাকে দেখিয়েছেন মহিমময় বিদ্রোহী রূপে। হেসিওদের শ্রোতা ছিল বঞ্চিত মূঢ় কৃষকেরা, তাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর স্বরূপ বুঝতে তারা ভুল করেছে; স্বর্গের অধিকার রক্ষার জন্য দেবতাদের নির্মম ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারের কারণ হিসাবে তারা বন্ধুকেই দায়ী করেছে। কিন্তু ইস্কাইলাসের যুগ ছিল অন্য রকম। স্বেচ্ছাচারীকে পরাস্ত করে এথেন্সে জন্মলাভ করেছে অভি-জাততন্ত্র, গণের মর্যাদা বহুদূর প্রসারিত। অভিজাততন্ত্রকে সীমিত করে আবার দেখা দিতে শুরু করেছে নতুন গণতন্ত্র। মানুষ পেতে চলেছে ব্যক্তির মর্যাদা, বাধাবিপদ অতিক্রম করে সমাজ ও রাষ্ট্রে তার নতুন প্রতিষ্ঠার সূচনা। আশাবাদ আর আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মানুষের চোখে জীবনের রহস্যময় বিচিত্র স্বরূপ ধরা পড়েছে। এমন রাষ্ট্র ও সমাজে প্রমিথিউস চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যাই স্বাভাবিক। এইজন্যই ইস্কাইলাসের প্রমিথিউস সদম্ভে ঘোষণা করে: "একটিমাত্র কথায় জেনে রাখো এইটি—প্রমিথিউস মানুষকে সমস্ত শিল্প-বিজ্ঞান দান করেছে।" আর এই জন্যই স্বেচ্ছাচারীর পায়ে সে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করে: "সমুদ্রের তরঙ্গকে অস্থির না-হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করো; আমাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা থেকে তা অনেক সহজ হবে।" ইস্কাইলাসের প্রমিথিউস অন্যায়, অবিচার ও স্বেচ্ছা-চারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মানুষের চিরকালের প্রতীক। আর তাই, আড়াই হাজার বছর পরে শেলি বন্দী প্রমিথিউসের মুক্তির গান না-গেয়ে থাকতে পারেন নি।

ইস্কাইলাসের শ্রেষ্ঠ রচনা অভিনীত হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৪৫৮ অব্দে। আর্তউসের অভিশপ্ত বংশের কাহিনীই এই ত্রয়ীর বিষয়বস্তু। এই তিনটি নাটকে ইস্কাইলাস তাঁর আদর্শবাদ ও নাট্যশিল্প-বোধের

চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত নীতির দ্বন্দ্বই এই নাটকে মুখ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক অনুশাসন ও পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনের মধ্যে একটা আপোস ঘটেছে, যদিও জয়ী হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক পক্ষ। কিন্তু এই নীতির দ্বন্দ্বকে নাটকীয় রূপদানই ইস্কাইলাসের কৃতিত্ব। কাসান্দ্রার আতঙ্ক, আগামেম্‌ননের বীভৎস হত্যা, সমাধির নিচে ইলেক্‌ত্রা ও ট্রয়ের বন্দিনীদের শোকগম্ভীর প্রার্থনা, আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় ক্লাইতেমেনেস্ত্রার ক্রুদ্ধ হুংকার, সর্বোপরি কৃষ্ণবেশ, রক্তমুখ, চামুণ্ডা মাতৃকাদের প্রতিহিংসার ভয়াবহ কোলাহল—সব মিলে নাটক তিনটিতে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইস্কাইলাসের নাট্য-প্রয়োগের বিশিষ্ট পদ্ধতি মনে রাখলে নাটক-ত্রয়ীর চাক্ষুষ আবেদন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইস্কাইলাস ছিলেন সচেতন শিল্পী, তাঁর নাটকগুলি যুগাদর্শে রঞ্জিত। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সমন্বিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সার্থক প্রচেষ্টার শিল্পরূপ তাঁর নাটকগুলি। জগৎ ও জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, জীবনের আনন্দ ও বেদনার মধ্যে যে বিরোধিতা, ইস্কাইলাস সেই দ্বন্দ্ব সেই বিরোধিতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মহাশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, মানুষকে তিনি দেখেছেন এক নতুন দৃষ্টিতে। বিশ্বজগতের ধারার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কোথায়? দেবতাদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত, তাঁদের বিধান কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। যত অসংগত, যত ভয়ংকরই হোক না কেন দৈববিধানের পিছনে আছে মঙ্গল। দৈববিধান লঙ্ঘনের ফল ভয়ানক, পাপ বা অভিশাপের ফল বংশ পরম্পরায় ভোগ করতে হয়। প্রতিশোধ বা রক্তপাত বৃহত্তর রক্তপাতের ভূমিকা রচনা করে। সমৃদ্ধি কাম্য কিন্তু তাতে যেন অহংকার না বাড়ে, তাহলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। মানুষের শক্তি ক্ষুদ্র, মানুষ অজ্ঞাত শক্তির হাতে ক্রীড়নক, তবুও মানুষ মহৎ কর্মের উদ্যোক্তা। মহৎ কর্মের উদ্যোগে

তার বিপর্যয়ও ঘটে, তবু মানুষ প্রতিনিবৃত্ত হয় না। যারা বীর, যারা মহৎ, বিপর্যয় তাদের প্রতিদ্বন্দ্ব জানায়। মানুষের এই আদর্শ ইস্কাইলাসের যুগের এথেন্সেরই আদর্শ। ইস্কাইলাস নিজে ছিলেন সৈনিক, তাঁর দৃষ্টিতে জীবন তাই রোমাঞ্চকর অভিযান। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে পদে পদে বিপদ ও শঙ্কাকে জয় করে মানুষকে অগ্রসর হতে হয়। অতীতের জন্য শোক নিরর্থক, সুখ ও শান্তির নীড় মানুষের জন্য নয়, জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেই মানুষের প্রতিষ্ঠা, মানুষের পরিপূর্ণতা। মানুষের যদি প্রখর ন্যায় ও কর্তব্য-বোধ থাকে, মানুষ যদি অহংকার শূন্য হয়, তাহলে আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মানুষ বিপর্যয়কে রোধ করতে পারে, বিজয়ী হতে পারে। এইজন্যই ইস্কাইলাসের ট্রাজিডির রস সোফোক্লিস ও ইউরিপিদিসের ট্রাজিডির রস থেকে স্বতন্ত্র। প্রতিকূল ভাগ্যের নির্মম পেষণে বিচূর্ণ মানবাত্মার আত্মপ্রতিষ্ঠার জয়ঘোষণাই তাঁর নাটকগুলিতে স্পষ্ট। করুণ রস ও ট্রাজিক রসের পার্থক্য কতখানি, তা ইস্কাইলাসের ট্রাজিডি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

ট্রাজিডির আনন্দ বিশ্লেষণ করেছেন আরিস্টটল, সোপেনহাওয়ার, নীট্‌শে, হেগেল। কিন্তু ইস্কাইলাসের ট্রাজিডির আনন্দ যেন একমাত্র নীট্‌শের কথাতেই ধরা পড়েছে। নীট্‌শে বলেছিলেন, ট্রাজিডির আনন্দ হচ্ছে "মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকবার ইচ্ছায় নবতর উপলব্ধি এবং সেই নবতর উপলব্ধির মুহূর্তে জীবনের অফুরন্ততা বোধের আনন্দ।" নীট্‌শে যেন ইস্কাইলাসের ট্রাজিডির দিকে লক্ষ রেখেই এই উক্তি করেছিলেন। অন্য আর কোনো কথাতেই ইস্কাইলাসের ট্রাজিডির রসের বিশিষ্টতা এমন ধরা পড়ে না।

ইস্কাইলাসের পর সোফোক্লিস। সোফোক্লিস বয়সে আঠারো বছরের ছোট। যে পারস্য যুদ্ধে ইস্কাইলাস অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারই বিজয়-উৎসবে বীণা হাতে নগ্নদেহে কিশোর সোফোক্লিস নৃত্য ও সংগীত পরিচালনা করেছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৭ অব্দে এথেন্সের কাছে কোলোনাসে সোফোক্লিসের জন্ম। এখানে তাঁর শৈশব কেটেছে, এই "শ্বেতশুভ্র কোলোনাসের" জয়গান করেছেন তাঁর কোলোনাসে অদিপাস নাটকে।

খ্রীঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দে নাটক-প্রতিযোগিতায় সোফোক্লিসের প্রথম আবির্ভাব এবং তিনি প্রৌঢ় ইস্কাইলাসকে পরাজিত করেন। এরপর থেকে তিনি সুদীর্ঘ ষাটবছর নাট্যজগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তিনি আঠারো বার পুরস্কার লাভ করেন। এথেন্সের মতো লেনিয়া-তেও দিঅনিসাসের উৎসব ও নাটক-প্রতিযোগিতা হতো, সোফোক্লিস সেখানেও অনেক পুরস্কার লাভ করেছিলেন। প্রথম না হলেও, কখনো প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় ছাড়া তৃতীয় হন নি। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, ফিলোক্লিসের কাছে তাঁর পরাজয়। ফিলোক্লিস ছিলেন ইস্কাইলাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। অনেকের মতে তাঁর নাটকগুলি ছিল পিতৃব্যেরই রচনা।

ইস্কাইলাস গ্রীক ট্রাজিডির যে আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন, তারই ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে সোফোক্লিস মসৃণ, সুন্দর, স্থায়ী রূপ দেন। নতুন আঙ্গিক তিনি আবিষ্কার করেন নি, পুরাতনকেই সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছেন। উদ্ভাবনী শক্তির বলিষ্ঠতায় এবং কল্পনাশক্তির মহিমায় তিনি ইস্কাইলাসের সমকক্ষ না হলেও, নাট্যকার হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নাটকের সব চেয়ে যে বড় গুণ স্থান-কাল-ক্রিয়ার নিগূঢ় ঐক্য, তা সোফোক্লিসের হাতে চরম রূপ পেয়েছে। আরিস্ট-টলের মতে, তাঁর ট্রাজিডিই গ্রীক ট্রাজিডির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সোফোক্লিস গ্রীক ট্রাজিডতে তৃতীয় নটের প্রবর্তন করেন। ইস্কাইলাসের কোনো কোনো নাটকে (যেমন কোয়েফোরোয় নাটকে

ক্লাইতেমনেস্ত্রা, অরেস্তিয়া এবং পিলাদেসের উপস্থিতি) তিনজন এক-সঙ্গে উপস্থিত থাকলেও সংলাপ দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তৃতীয় জনের কোনো কথা নেই। কিন্তু সোফোক্লিস তিনজনের একই সঙ্গে সংলাপ দিয়ে নাটকীয় গতি দ্রুততর করেছেন। দুজন নট প্রবর্তনে ইস্কাইলাসের নাটকেই কোরাসের ভূমিকা অনেকখানি অপ্রধান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘটনার পরিণতিতে তাদের গুরুত্ব একেবারে খর্ব করা সম্ভব হয় নি। তৃতীয় নটের ফলে কোরাসকে অপ্রধান দর্শকের পর্যায়ে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হল, কোরাস হল নাটকের গতিপথে অনেকটা রিলিফের মতো। আর তার ফলে নাটকে পাত্রপাত্রীর মোট সংখ্যা বেড়ে গেল, নাটকে এখন থেকে ঘটনার বৈচিত্র্য আমদানি হল।

সোফোক্লিস ইস্কাইলাসের মতো ত্রয়ী রচনা করেন নি। তার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, তিনজন নট প্রবর্তনের ফলে নাটকের ঘটনাবস্তু অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত জটিলাকারে দেখাবার সুযোগ বেশি। এক্ষেত্রে একই কাহিনীর ক্রমানুবৃত্তি হিসাবে তিনখানি নাটক বিরাটকায় হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। সোফোক্লিসের নাটকগুলি অপেক্ষা-কৃত দীর্ঘ, প্রতিটি নাটককে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নাটক হিসাবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর নাটকের প্লট জটিল, নাটকীয়তার অতি সূক্ষ্মতাও প্লটে ধরা পড়েছে। ত্রয়ীর পরিকল্পনার মধ্যে প্রাচীন মহাকাব্য-আবৃত্তির ধারাবাহিকতার যে চিহ্নটুকু ছিল, তা বর্জন করে সোফোক্লিস তাঁর নাটককে পূর্ণাঙ্গ খাঁটি নাটক করে তুলেছেন।

সোফোক্লিস তাঁর নাটকের প্রযোজক, মঞ্চনির্দেশক হলেও অপ্রধান ভূমিকা ছাড়া কখনো প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরে ত্রুটি ছিল। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, তিনি চিত্রিত দৃশ্যপটের প্রবর্তক। তিনি কোরাসের সংখ্যা পনেরো থেকে বারোতে নির্দিষ্ট করেন।

নব্বই বছরের সুদীর্ঘ জীবনকালে এথেন্সের জাতীয় জীবনের

অনেক কিছু সোফোক্লিসের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এথেন্সের গৌরবের সূচনায় তাঁর আবির্ভাব, আর তিরোভাব তার পতনের ক্রান্তি-কালে। একটা জাতির উত্থানপতনের তিনি প্রায় এক শতাব্দীর সাক্ষী। রাজনৈতিক ও পৌরজীবনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এথেন্সের নাগরিক-রীতি অনুযায়ী তিনি যুদ্ধে সৈনাপত্য করেছেন, রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন, এস্ক্লেপিয়াসের পূজার পুরোহিতও তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল এক নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ মনোবৃত্তি। ইস্কাইলাসের মতো প্রচণ্ড আবেগ তাঁর ছিল না। কোলাহলমুখর যুগের মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন একান্তভাবে আত্মমুখীন। জীবন-রহস্যের গভীরতা তাঁর সমস্ত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। যুগের পরিবর্তনেও তাঁর দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে নি। রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো রকম অসংগতিই বয়ঃকনিষ্ঠ ইউরিপিদিসের মতো তাঁর স্থৈর্য বিচলিত করতে পারে নি।

পারস্য-অভিযান প্রতিহত করার পর এথেন্সে যে নতুন জীবন, নতুন আদর্শবাদের জোয়ার এসেছিল, সোফোক্লিসের জীবনের মধ্যভাগেই তাতে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। মারাথন, সালামিস, থার্মপাইলিতে যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, সেইসব গ্রীকদের আদর্শ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হারিয়ে গেল। সমগ্র গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য যে-এথেন্স সর্বস্ব পণ করেছিল সেই এথেন্সই স্বাধীনতার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সে হল শক্তিশালী, স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী। সমগ্র গ্রীসকে পদানত করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ল এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। পিলোপনেশিয় যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন সোফোক্লিস বৃদ্ধ। ক্লেঅনের যুদ্ধবিলাসিতা, আলকাবাইদিসের সিসিলি অভিযান ও পরবর্তীকালের বিশ্বাসঘাতকতা, স্কিঅন ও মেলোসের নির্মম হত্যাকাণ্ড—সোফোক্লিস সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। এথেন্সের নীতি ও আদর্শের সৌধচূড়া তাঁর চোখের সামনেই ভেঙে পড়তে দেখেছেন। সিসিলির অভিযানে এথেন্স পরাজিত হল। এই জাতীয় দুর্দিনে

স্বেচ্ছায় নির্বাসিত মহাকবি ইউরিপিদিসের মৃত্যুর সংবাদ এল। এর অল্পকাল পরে খ্রীঃ পূঃ ৪০৬ অব্দে এইগোসপোতামির চূড়ান্ত পরাজয়ের কয়েক মাস আগে সোফোক্লিসের মৃত্যু হল। সোফোক্লিস কৈশোরে পারস্য যুদ্ধের বিজয়োৎসবে কোরাসের নেতৃত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় এথেন্স শত্রুবেষ্টিত। শহরের বাইরে তাঁকে সমাহিত করার উপায়ও তখন নেই। ব্যক্তিগত ব্যবহারে সোফোক্লিস ছিলেন নম্র ও ভদ্র, ঈর্ষা ও বিদ্বেষের অনেক উর্ধ্বে। তখনকার দিনের বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সর্বোপরি এথেন্সের মানুষের মনে তাঁর শ্রদ্ধার আসন ছিল অটুট। তাই মৃত্যুর পর তারা তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করেছিল।

সোফাক্লিস প্রায় একশো তিরিশখানি নাটক লিখেছিলেন। তার মধ্যে সাতখানি মাত্র টিকে আছে। এই সাতখানি ইস্কাইলাসের রচনার মতোই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট হয়েছিল। এদেরও অনেক টীকাসম্বলিত অনুলিপি পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে আন্তিগোনি প্রথম দিকের রচনা, সর্বশেষ রচনা কোলো-নাসে অদিপাস। ফিলোকতেতিসের রচনাকাল সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৪০৯ অব্দ। অন্য চারখানি—আজাক্স, ত্রাকিনিআয়, ইলেক্ত্রা ও অদিপাস তুরান্নোসের রচনাকাল সম্পর্কে নিঃসন্দেহে কিছু বলা কঠিন। সবগুলি নাটকের বিষয়বস্তুই গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া।

আজাক্সের শোচনীয় কাহিনী নিয়ে ইস্কাইলাসও নাটক লিখে-ছিলেন। একিলিসের বর্ম নিয়ে আজাক্স ও অদিসিউসের কলহের পরিণতি ঘটে আজাক্সের আত্মহত্যায়। দুই নাট্যকার পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে একই কাহিনী নাট্যায়িত করেছেন। ত্রাকিনিআয় নাটকের বিষয়বস্তু স্ত্রী দেইনেইরার ঈর্ষার ফলে হেরাক্লিসের শোচনীয় মৃত্যু। ইলেক্ত্রা নাটকে অরেস্তিসের প্রত্যাবর্তন এবং ইলেক্ট্রার নির্দেশে ক্লাইতেমনেস্ত্রা ও এইগিসথোসের হত্যাকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইস্কাইলাসের কোয়েফোরোয় একই ঘটনা নিয়ে লেখা,

তবে নাটকটি ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইলেক্ত্রার চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি। হেরাক্লিসের ধনুর্বাণের অধিকারী ফিলোকতেতিসকে গ্রীক পক্ষে আনার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে ফিলোকতেতিস নাটক। ইস্কাইলাস ও ইউরিপিদিসও এই একই কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন।

অদিপাস তুরান্নোস বা রাজা অদিপাস সোফাক্লিসের শ্রেষ্ঠ রচনা, আরিস্টটলের মতে গ্রীক ট্রাজিডির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অদিপাস তুরান্নোস, কোলোনাসে অদিপাস ও আন্তিগোনি একই কাহিনীর ক্রমানুবৃত্তি। অদিপাসকে নিয়ে ইস্কাইলাসও নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু সোফো-ক্লিসের নাটকের মর্যাদা স্বতন্ত্র। আন্তিগোনি প্রথম বয়সের রচনা, অদিপাস তুরান্নোস পরিণত বয়সের রচনা এবং কোলোনাসে অদিপাস সর্বশেষ রচনা। কিন্তু ঘটনার পৌর্বাপর্যের দিক থেকে আন্তিগোনি কাহিনীর সর্বশেষের ঘটনা।

অদিপাস তুরান্নোসের কাহিনী ভয়াবহ। লেইয়াস ও জোকাস্তা থিবির রাজারাণী। তাদের সন্তান জন্মালে দৈববাণী হয়েছিল, এই সন্তান পিতৃহন্তা ও মাতৃগামী হবে। তারা সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু ভাগ্যবলে সেই সন্তান করিন্থে পালিত হয়ে সম্পূর্ণ অগোচরে পিতাকে হত্যা এবং মাতাকে বিবাহ করল। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য কাহিনীর বিন্যাসকুশলতায়। সোফোক্লিসের অন্যান্য নাটকের তুলনায় এই নাটকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতই মুখ্য। 'পেরিপেতি' ও 'আনাগ্নরিসিস'-যুক্ত জটিল প্লটের নিখুঁত নিদর্শন রূপে আরিস্টটল এই নাটকটির উল্লেখ করেছেন। মূল নাটকটি না পড়লে প্লটের নাটকীয় বিন্যাসটি বোঝানো অসম্ভব।

অদিপাসের নির্বাসিত জীবনের শেষ অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে কোলো-নাসে অদিপাস নাটকে। এটির বৈশিষ্ট্য কাব্যসৌন্দর্যে। কাহিনী অংশ ক্ষীণ হলেও বিড়ম্বিত অদিপাসের চরিত্র ক্ষীণসূত্রেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্বাদের দিক থেকে কোলোনাসে অদিপাস অদিপাস

তুরান্নোসের বিপরীত। একটিতে অদিপাস সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির চূড়া থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন নরকের অতল গহ্বরে, অপরটিতে ঘৃণ্য অভিশপ্ত অদিপাস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন দেবমর্যাদায়। একটিতে স্বর্গ হারানোর অভিশাপ, অন্যটিতে স্বর্গ পুনরুদ্ধারের আশীর্বাদ। সিসেরোর মতে, কোলোনাসে অদিপাসের মতো কাব্যময় ট্রাজিডি গ্রীক নাট্যসাহিত্যে আর একটিও নেই।

আন্তিগোনির কাহিনী অদিপাসের বংশের পরবর্তী কাহিনী। অদিপাসের পাপে তার বংশই অভিশপ্ত হয়েছিল। অদিপাসের কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাদ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র পোলিনিসাস ছয়জন বিদেশী রাজার সাহায্যে থিবি আক্রমণ করেছিল। যুদ্ধে বিদেশী আক্রমণকারীরা বিতাড়িত হল, কিন্তু দুই ভাইই নিহত হল। রাজপ্রতিভূ ক্রেঅন ঘোষণা করল, দু'জনেই রাজকুমার হলেও কেবলমাত্র দেশরক্ষায় নিহত বীর এতোক্লিসের যোগ্য সৎকার হবে, দেশবৈরী পোলিনিসাসের সৎকার হবে না। যে সৎকার করবে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। দেশবৈরী হলেও পোলিনিসাস ইসমেনি ও আন্তিগোনির ভাই, যথাযোগ্য সৎকার করা তাদের পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু ইসমেনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস পেল না। আন্তিগোনি একাই এগিয়ে এল সৎকারে। কাহিনীর এই অংশ পর্যন্ত নিয়ে ইস্কাইলাস লিখেছিলেন সেপ্তেম নাটক। সোফোক্লিসের আন্তিগোনির কাহিনী এর পর থেকে এবং সে কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। আন্তিগোনি ভাইয়ের সৎকার করতে গিয়ে ধরা পড়ল, তাকে পাহাড়ের গুহায় বন্দী করে রাখা হল শাস্তি হিসাবে। সেখানে আন্তিগোনি আত্মহত্যা করল, তার সঙ্গে আত্মহত্যা করল তার প্রণয়ী ক্রেঅনের পুত্র হেইমোন, পুত্রের শোকে ক্রেঅনও আত্মহত্যা করল। দেশের প্রতি কর্তব্য ও ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য—এই দুই কর্তব্যের দ্বন্দ্বই আন্তিগোনির বিষয়বস্তু। একে বলা যেতে পারে ধর্ম ও মানবতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে পীড়িত আন্তিগোনি মানবতাকেই বরণ

করে নিয়েছে। সোফোক্লিসের আন্তিগোনি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রের অন্যতম। এই নাটকেই আছে কোরাসের মুখে সোফোক্লিসের মানব বন্দনা—"জগতে আশ্চর্য আছে অনেক,—কিন্তু সকলের সেরা মানুষ........"— গানটি।

বক্তব্যের একমুখিতা, কাঠামোর সামগ্রিক ঐক্য এবং সারল্যই সোফোক্লিসের নাটকের বৈশিষ্ট্য। নিছক নাট্যগুণে ইস্কাইলাস শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নাটকীয় কলাকৌশলে সোফাক্লিস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইস্কাইলাসের কোয়েফোরোয়-এর সঙ্গে ইলেক্‌ত্রার তুলনা করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। নরনারীর যৌন আকর্ষণের আবেগ সোফোক্লিস কোথায়ও ভালো করে ফোটান নি। আন্তিগোনির প্রেমের দৃশ্য সহজেই উপেক্ষা করেছেন। তেরেসার সঙ্গে আজাক্‌সের এবং দেইনেইরার সঙ্গে হেরাক্লিসের ব্যবহারের মধ্যেও ঔদাসীন্য ফুটে উঠেছে। ট্রাজিডির ভাববস্তুতেও সোফোক্লিস বিরাট পরিবর্তন এনেছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী। ধর্মের প্রভাব তাঁর রচনায় ইস্কাইলাসের মতো তত বেশি উগ্র নয়, অনেকখানি সংযত। মানুষের বাসনা-কামনা-দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে তিনিই প্রথম ট্রাজিডির বিষয়বস্তু করেছেন। তাঁর ট্রাজিডির সবচেয়ে বড় কথা মানব-রস। কিন্তু তাঁর মানুষ কখনো পৌরাণিক পটভূমিকাচ্যুত হয় নি। পরবর্তীকালের গ্রীকেরা সোফোক্লিসকে হোমারের সঙ্গে তুলনা করতো। সোফাক্লিসের মানুষ রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ নয়, মানুষের আদর্শ রূপ। ইউরিপিদিসের সমকালীন হলেও তিনি ছিলেন এক যুগ আগের মানুষ। রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো অসঙ্গতিই তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে সোফোক্লিস ছিলেন রক্ষণশীল। রাজনীতিতে তাঁর রক্ষণশীলতার পরিচয় আছে। তাঁর জীবনদৃষ্টিতেও রক্ষণশীলতা স্পষ্ট প্রচলিত ধর্ম, রাষ্ট্রবিধান ও সমাজনীতিকে তিনি কখনো আঘাত করেন নি। ইস্কাইলাসের মতো নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার উদ্যম ও উৎসাহ তাঁর ছিল না। এবং না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ,

সোফোক্লিসের যৌবনেই এথেন্সের যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে, এক আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এই রাষ্ট্র ও সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকেই তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। জীবনসমুদ্রের অতল গভীরে তিনি ডুব দিয়েছিলেন, উপরের তরঙ্গভঙ্গ তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। তাঁর জীবনবোধ রক্ষণশীল হতে পারে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল কখনোই নয়।

ট্রাজিডির আনন্দ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুঃখবাদী দার্শনিক সোপেনহাওয়ার "স্বীকৃতি" (acceptance) কথাটির উপর জোর দিয়েছিলেন। এই "স্বীকৃতি" সোফোক্লিসের নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজ্য। এই "স্বীকৃতি" নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া নয়, নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ নয়। এই "স্বীকৃতি" শক্তি যোগায়, বেদনা ও পীড়নের মধ্যেও সহ্য করার এক আশ্চর্য শক্তির জন্ম দেয়। এই "স্বীকৃতি" নিষ্ক্রিয় নয়, সর্বাংশে সক্রিয়। কিন্তু এ সক্রিয়তা সংগ্রামীর সক্রিয়তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ এক অপূর্ব মানস-সম্পদ। জগৎ ও জীবনের রহস্য মানুষের দৃষ্টিসীমার বহির্ভূত, তার রহস্য বৃথাই উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মানুষ জীবনের কক্ষচ্যুত হয়। ভাগ্য অপ্রতিরোধ্য, তার বিধান অনতিক্রম্য। তবু মানুষ কেবল-মাত্র দর্শক নয়, পরিণাম মর্মান্তিক হলেও তার কর্তব্য আছে। তাকে ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য বিচার করতে হয়। সংসারে মহত্ত্ব আছে, স্নেহ প্রেম বন্ধুত্ব অনেক কিছু আছে। ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক হলেও অসহায় মানুষ সংসারের এই মহৎ গুণের অংশভাক্ হতে পারে, মহত্তের সঙ্গী হতে পারে। আর, এরই ফলে ভাগ্যের হাতে পীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবাত্মা লাভ করতে পারে দেবদুর্লভ মহত্ত্ব, তার মৃত্যু হয়ে উঠতে পারে সুন্দর ও মহনীয়; এই পীড়া, এই যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই লাভ করতে পারে দেবতার সম্মান। সোফোক্লিসের ট্রাজিডির এই হচ্ছে ভাববস্তু।

ইউরিপিদিসের জন্মস্থান সালামিসে। প্রবাদ আছে, খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে যেদিন এই সালামিসে গ্রীক ও পারস্যের ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ হয়, সেইদিনই তাঁর জন্ম। এথেন্সের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় ও যুগান্তকারী ঘটনার সঙ্গে তার তিন মহান নাট্যকারের জীবন আশ্চর্যভাবে সম্পর্কিত।

ইউরিপিদিস অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান ছিলেন। নৃত্যগীত ছাড়াও তিনি কৈশোরেই দেহচর্চায় পারদর্শী হয়েছিলেন। মুষ্টি ও মল্লযুদ্ধের অনেক প্রতিযোগিতায় তিনি জয়লাভ করেছিলেন। সম্ভবত চিত্রকলাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু তিনি অতি অল্প বয়সেই ট্রাজিডি রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৪৫৫ অব্দে প্রথম তাঁর নাটক উৎসবে প্রদর্শনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু তিনি মাত্র তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স তিরিশ। প্রথম দিকে তাঁর রচনার পরিমাণ খুবই কম ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪৩৮ অব্দ পর্যন্ত তাঁর নাটকের সংখ্যা সতেরো খানির বেশি হয় নি, কিন্তু জীবনের শেষ বত্রিশ বছরে প্রায় পঁচাত্তর খানি নাটক লেখেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি বাক্‌খাই রচনার সময় বয়স সত্তরেরও বেশি। দেহের বার্ধক্য তাঁর প্রতিভায় তিলমাত্র ছায়া ফেলতে পারে নি। একথা অবশ্য ইস্কাইলাস ও সোফোক্লিসের পক্ষেও সত্য। তিনজনই সুদীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ছিলেন এবং যত বৃদ্ধ হয়েছেন, ততই যেন তাঁদের প্রতিভা আরও উজ্জ্বল, আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে এ ধরনের প্রতিভা দুর্লভ।

নাট্যকার হিসাবে প্রচুর খ্যাতি সত্ত্বেও ইউরিপিদিসের ভাগ্যে পুরস্কার লাভ কমই ঘটেছে। তিনি মাত্র পাঁচ বার পুরস্কার পান, তাও একবার তাঁর মৃত্যুর পরে। নগর-দিওনিসিয়া ছাড়া অন্যত্রও তিনি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ইস্কাইলাস ও সোফোক্লিসের মতো মঞ্চ-পরিচালনা এবং অভিনয়ের খুঁটিনাটির বিস্তারিত ব্যাপারে

তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল না। তাঁর ব্যর্থতার অনেক কারণের মধ্যে এটাও হয়ত একটা কারণ।

ট্রাজিডির আঙ্গিকের দিক থেকে ইউরিপিদিস কিছু কিছু নতুনত্বের প্রবর্তন করেছেন। নাটকের আদি ও অন্তে তিনি 'প্রোলোগ' ও 'এপিলোগ' যোজনা করেন। 'প্রোলোগ' যোজনা অবশ্য ট্রাজিডির আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন নয়। থেসপিস যে নটের প্রবর্তন করেছিলেন তার কাজ ছিল কোরাসের আগে সর্বপ্রথম ঘটনার একটা চুম্বক এবং পরিণতির ইঙ্গিত দেওয়া। এরই নাম ছিল 'প্রোলোগ'। ইস্কাইলাস-সোফোক্লিসের নাটকে ট্রাজিডি অভিনয়ের আগে 'হেরাল্ড' এই 'প্রোলোগের' কাজ করে দিত। গল্পাংশ জানা থাকায় 'প্রোলোগের' খুব বেশি তাৎপর্য ছিল না! প্রাচীন 'প্রোলোগ'কে ইউরিপিদিস পুনঃপ্রবর্তন করেন, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, যাকে দিয়ে 'প্রোলোগ' বলানো হয়, সে নাটকের পাত্র-পাত্রীর বহির্ভূত কেউ নয়, হয় সে কোনো পাত্র, নয়তো দৈবশক্তিসম্পন্ন এমন কোনো কেউ, যার নাটকের ঘটনাবস্তু সম্পর্কে আগ্রহ আছে। এর ফলে 'প্রোলোগ' নিছক বিবৃতিমূলক না হয়ে অনেকখানি নাটকের ঘটনার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষের দিকের বক্তা 'দৈবযন্ত্র' (deus ex machina) সাধারণত দেবতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য কোনো পাত্র। এই 'এপিলোগে'র উদ্দেশ্য ফলশ্রুতি দান। কিন্তু তিনি সর্বত্র 'এপিলোগ' ব্যবহার করেন নি।

ইউরিপিদিস কিছু কিছু নতুন ধরনের নাটক রচনা করেছেন, যাদের প্রচলিত অর্থে ট্রাজিডি বলা চলে না। আধুনিককালে যে ধরনের নাটককে বলি ট্রাজি-কমেডি, ফ্যাণ্টাসি, তিনি সেই ধরনের নাটকও লিখেছেন। তাঁর নাটকে কোরাসের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত অপ্রধান। কোরাস ও নাটকের পাত্রপাত্রীর কথোপকথন বর্জন করে তিনি সাধারণভাবে পাত্রপাত্রীর একক সংগীত (solo) এবং সংগীতমূলক কথোপকথনে গুরুত্ব আরোপ করে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও ইউরিপিদিস সোফোক্লিসের সমসাময়িক, তাঁদের মৃত্যু হয় কয়েক মাস আগে পরে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। দুজনে দুই যুগের প্রতিনিধি। এথেন্সের ক্রান্তি-কালের জীবন-জিজ্ঞাসা দুই মহাকবিকে পৃথক পথের অনুবর্তী করেছিল। এথেন্সের রাষ্ট্রাদর্শের অধঃপতন, সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক জীবনের অপবিত্রতা, ন্যায় ও ধর্মের গ্লানি—জাতীয় জীবনের অবক্ষয়ের কোনো কিছুই সোফোক্লিসের মনে রেখাপাত করতে পারে নি। স্থির প্রত্যয়ের দৃষ্টিতে তিনি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আদর্শ রূপটি, দেবতাদের মধ্যে দেখেছিলেন শাশ্বত ন্যায়ের বিধান, অবক্ষয়ের শত চিহ্ন সত্ত্বেও তিনি এথেন্সের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজের অনির্বাণ আলোকশিখা। কিন্তু এথেন্সের অধঃপতন, নীতিহীনতা ইউরিপিদিসের মনে অস্থির তরঙ্গ তুলেছিল।

ইউরিপিদিস ছিলেন ইস্কাইলাসের মতোই সমাজ সচেতন। কৈশোর ও যৌবনের স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে পদে পদে খণ্ডিত ও বিড়ম্বিত হতে দেখে তিনি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, উপাসক-দের স্বার্থদ্বন্দ্বে কেমন করে জাতির ধর্মের অধঃপতন ঘটেছিল; তিনি দেখেছিলেন, নারীর পরাধীনতার ফলে কেমন করে এথেন্সের পারি-বারিক জীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল। গণতন্ত্রের নামে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনার ভণ্ডামি তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। এথেন্সের ক্রমবর্ধমান দাসত্বপ্রথার পীড়াদায়ক অবস্থা তিনি দার্শনিকতার ধূম্রজালে আড়াল করতে চান নি। পঞ্চম শতাব্দীর এথেন্সের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি প্রশ্নকে তিনি মুখর করে তুলেছিলেন। সোফোক্লিসের মতো নির্লিপ্ত শিল্পী তিনি নন, তিনি যুগ ও জীবনের সমালোচক শিল্পী। প্লেটোর মতে যে সমালোচনা ব্যতীত মানুষের বাঁচাটাই অর্থ-হীন। আর এই জন্যই তিনি ছিলেন সমসাময়িক অপ্রিয় শিল্পী।

ইস্কাইলাস-সোফোক্লিসের মতো ইউরিপিদিস নাগরিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের আদর্শকে অভ্রান্তভাবে গ্রহণ না করলে রাজনৈতিক ও পৌরজীবনে সার্থকতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাঁর মতো 'জিজ্ঞাসু' মনের পক্ষে এ জীবন এড়িয়ে চলাই স্বাভাবিক। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন, খুব অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণত জনজীবন থেকে তিনি দূরে দূরে থাকতেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন আনাক্‌জাগোরাস, যার কাছ থেকে তিনি প্রচলিত ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে সংশয়বাদের দীক্ষালাভ করেছিলেন। প্রচলিত ধর্মবিরোধী যে-গ্রন্থ রচনার জন্য প্রোতাগোরাস এথেন্স থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেই গ্রন্থ নাকি ইউরিপিদিসের বাড়িতে প্রোতাগোরাস প্রথম পড়ে শুনিয়েছিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ সোক্রাতিসের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। সোক্রোতিস সাধারণত নাটক দেখতেন না, কিন্তু তিনি নাকি ইউরিপিদিসের নাটকের নিয়মিত দর্শক ছিলেন। আনাক্‌-জাগোরাস, প্রোতাগোরাস যে অপরাধে এথেন্স থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং আরও পরে সোক্রাতিস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, সেই একই অপরাধে ইউরিপিদিসও অপরাধী। আরিস্তোফানিস বিদ্রূপ করলেও সত্যিকথাই বলেছিলেন: "ইউরিপিদিসের দোষ তিনি এথেন্সকে শিখিয়েছেন চিন্তা করতে, চোখ মেলে দেখতে, বুঝতে, সন্দেহ করতে, সবকিছু প্রশ্ন করতে।" এমন শিল্পী যুগের অপ্রিয়ভাজন হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

শেষ জীবনে এথেন্সে বাস করা ইউরিপিদিসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সালামিসের নির্জন গুহায় নিজের গ্রন্থাগারে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে ডুবে থেকেও তিনি শান্তি পান নি। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশ ও সমাজের মর্মান্তিক অপমৃত্যু এবং ক্রমবর্ধমান বিরূপতা তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। এথেন্সের কাছে যে-মাসিদন বর্বরতুল্য, তার রাজা আর্কেলিউস বহু আগেই তাঁকে তাঁর রাজসভায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর রাজসভায় তিনি আশ্রয়

নিলে আর্কেলিউস সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মাসিদনের পর্বত-বন্ধুর প্রদেশে অনিয়ন্ত্রিত আদিম জীবন ও রুক্ষ নগ্ন সৌন্দর্যময় পরিবেশে যেন তিনি দক্ষিণ গ্রীসের ছিন্নমস্তা সভ্যতাকে ভুলতে চেষ্টা করলেন। এখানেই তিনি রচনা করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি বাক্‌খাই। এখানেই খ্রীঃ পূঃ ৪০৬৭ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এথেন্সে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছলে জরাতুর সোফোক্লিস প্রকাশ্য শোকযাত্রায় অশ্রুপাত করেছিলেন।

ইউরিপিদিসের নাটকের সংখ্যা বিরানব্বইখানি। তার মধ্যে মাত্র উনিশখানি টিকে আছে। এদের মধ্যে রেসাস তাঁর রচনা কি না তাতে সন্দেহ আছে। সাইক্লোপস্ ট্রাজিডি নয়। সাতুর-নাটক এবং গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সাতুর-নাটকের নিদর্শন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য পরবর্তীকালে ইউরিপিদিসের নয়খানি নাটক মনোনীত করা হয়েছিল। ইস্কাইলাসের সাতখানি, সোফোক্লিসের সাতখানি এবং ইউরিপিদিসের নয়খানি এবং আরিস্তো ফানিসের এগারোখানি কমেডি—মোট চৌত্রিশখানি গ্রীক নাটক ছিল মধ্যযুগের পাঠ্যতালিকা। কিন্তু তালিকাভুক্ত ইউরিপিদিসের নয়খানি নাটক কোনোক্রমেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁর আরও দশখানি নাটক পরবর্তীকালে পাওয়া গিয়েছে। এই দশখানির টীকাসম্বলিত কোনো অনুলিপি মেলে নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে এগুলি মধ্যযুগের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত ছিল না। কিন্তু এই দশখানির মধ্যেই আছে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বাক্‌খাই।

নাটকগুলির মধ্যে আলসেসতিস প্রথম যুগের রচনা। খ্রীঃ পূঃ ৪৩৮ অব্দের প্রতিযোগিতায় এটি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল। প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন সোফোক্লিস, কিন্তু কোন নাটকের জন্য তা জানা যায় না। আলসেসতিস খাঁটি ট্রাজিডি নয়, আধুনিক অর্থে ট্রাজি-কমেডি। স্বামী আদমেতাসের জীবনের বিনিময়ে নিজের

জীবন দান এবং হেরাক্লিস কর্তৃক মৃত্যুর হাত থেকে বন্ধুপত্নীকে উদ্ধার—এই নাটকের বিষয়বস্তু। মৃত্যুর মহৎ কারুণ্য এবং হেরাক্লিসের সুন্দর উদার চরিত্রের হাস্যমাধুর্য মিলিয়ে ইউরিপিদিস এক অভিনব নাটক রচনা করেছেন। প্রেমের এই অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী বহু পরবর্তীকালের কবিদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে। আলসেসতিসের কাহিনী-কে ব্রাউনিং বলেছেন: "আশ্চর্যতম, করুণতম, সুন্দরতম সংগীত।"

আলসেসতিসের সাত বছর পরে লেখা মিদিয়া ইউরিপিদিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রেম ও প্রতিহিংসার কাহিনী নিয়ে এই ধরনের ভয়ংকর সুন্দর ট্রাজিডি গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে আর একটিও নেই। কোলচিস থেকে জেসন সোনালি পশম নিয়ে আসতে পেরে-ছিল রাজকুমারী মিদিয়ার সাহায্যে। মিদিয়া জেসনের প্রেমাসক্তা হয়ে তার সঙ্গেই দেশত্যাগী হয়েছিল। সিংহাসন লাভের চেষ্টা ব্যর্থ হলে নির্বাসিত জেসন মিদিয়া ও দুই শিশুপুত্রসহ করিন্থের রাজার কাছে আশ্রয় পায়। সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য জেসন করিন্থের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে মনস্থ করে। ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ংকরী মিদিয়া নববধূর ভয়াবহ মৃত্যু ঘটিয়ে নিজের দুই শিশুপুত্রকে হত্যা করে। সর্বস্ব হারানোর মর্মান্তিক জ্বালাই শুধু জেসনের সার হয়। নায়িকাকে আদর্শায়িত করার তিলমাত্র চেষ্টা মিদিয়া নাটকে নেই। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় পুঞ্জীভূত ঘৃণা যে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছে, যে ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করেছে, তাকে কোনো আদর্শ, কোনো নীতির শান্তিজল দিয়ে স্নিগ্ধ করা যায় না। নারী-হৃদয়ের প্রখরতম দুটি বৃত্তি—প্রেম ও বাৎসল্য, এই দু'টি বৃত্তিরই বিস্ফো-রণ ঘটেছে মিদিয়া নাটকে। এ এক আশ্চর্য বাস্তব চিত্র। এই বাস্তবতার জন্যই ইউরিপিদিসের বিশিষ্টতা। পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধের এথেন্সের লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মূক নারীর হৃদয় নাটকে যেন প্রচণ্ড স্পর্ধায় মুখর হয়ে উঠেছে। মিদিয়া আর জেসন পুরাণের মহান চরিত্র নয়, পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসের নাগরিক। মিদিয়া

বিদেশিনী, সে গ্রীক নয়, তার সন্তানেরা এথেন্সের আইনে বৈধ নয়। জেসন তাই রাজকুমারীকে বিয়ে করে বৈধ সন্তানের অধিকারী হতে চায়। প্রেম তার কাছে মূল্যহীন, স্ত্রীর মর্যাদা অকিঞ্চিৎকর। এই যুগের এথেন্সের পারিবারিক জীবনের গ্লানিকর দিকটি উদ্‌ঘাটিত করে-ছিলেন স্পষ্ট ভাষায় উত্তম পুরুষে দেমোস্থিনিস: "নটী আছে আমাদের অবসর বিনোদনের জন্য, প্রাত্যহিক কামচরিতার্থতার জন্য আছে দাসীরা সংসার পরিচালনা আর বৈধ সন্তান প্রসবের জন্য বিবাহিতা স্ত্রীরা।" এমন যুগে, এমন সমাজে মিদিয়ার মতো মর্যাদাময়ী নারী ও স্ত্রীর পরিণতি কী? সেই প্রশ্নেরই উত্তর মিদিয়া নাটকে। মিদিয়া নাটকটির জন্য ইউরিপিদিস তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন, প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন ইস্কাইলাসের পুত্র ইউফোরিঅন, আর সোফোক্লিস দ্বিতীয় পুরস্কার।

হেরাক্লিদাই নাটকখানি রচনার সঠিক তারিখ জানা যায় না। এক শক্তিশালী শত্রু কর্তৃক এথেন্স আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধের নীতি এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকে এথেন্সের অতীত গৌরবের মহিমা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করা হয়েছে। সম্ভবত নাটকখানি পিলোপনেশীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে গ্রীঃ পূঃ ৪৩০-২৯ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিপ্‌পোলিতাস প্রদর্শিত হয় গ্রীঃ পূঃ ৪২৮ অব্দে। যতদূর জানা যায়, একমাত্র এই নাটকখানির জন্যই ইউরি-পিদিস প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। কাহিনীর বিন্যাসকুশলতায় হিপ্‌পোলিতাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রীক নাটকের ইতিহাসে এটি এই জন্য স্মরণীয় যে, এই প্রথম যৌনবাসনা নাটকের বিষয়ীভূত হল: কৌমার্যব্রতধারী হিপ্‌পোলিতাসের প্রতি বিমাতা ফিদ্রার অবৈধ প্রেম এবং প্রত্যাখ্যাতা ফিড্রার আত্মহত্যা এবং তার মিথ্যা অভিযোগে হিপ্‌পোলিতাসের সর্বনাশ নাটকের কাহিনীবস্তু। নাটকে ফিদ্রার চরিত্র ইউরিপিদিসের প্রখর বাস্তবতার নিদর্শন। মিদিয়া চরিত্রের

যে বাস্তবতা তার চারপাশে একটা অলৌকিকতার গণ্ডি আছে। মিদিয়া জাদুকরী, সে মন্ত্রসিদ্ধা—তার বাসনা-কামনার উদ্দামতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায়—সবকিছুই বাস্তবতা একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থিত হয়। কিন্তু ফিদ্রার চরিত্রে অসাধারণত্বের তথাকথিত কোন ঔজ্জ্বল্য নেই। অচরিতার্থ কামনার পীড়ন, পাপবোধ ও মর্যাদাবোধের দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত ফিদ্রা প্রেমপীড়িতা নিখিল নারীত্বের প্রতিনিধি। ফিদ্রা আদর্শ নারী নয়, সাধারণ চরিত্র। এই সাধারণত্বই তার অসাধারণত্বের গৌরব। এইজন্যই এর প্রতিহিংসার পন্থা এতো গভ্যময়, এইজন্যই ইউরিপিদিসের ফিদ্রা আজও একান্তভাবে আধুনিক। ফিদ্রার কাহিনী নিয়ে সোফোক্লিসও নাটক লিখেছিলেন। সে নাটক টিকে থাকলে এই কাহিনীর নিশ্চয়ই অন্যতর ভাষ্য পাওয়া যেতো।

ইস্কাইলাসের সেপ্তেম নাটকের পরবর্তী ঘটনা নিয়ে ইউরিপিদিস লিখেছেন সাপ্লিস নাটক। থিবি আক্রমণ করতে এসে আরগসের সৈন্যরা পরাজিত হলে বিজয়ী থিবি নিহত শত্রুসৈন্যদের সৎকার করতে অস্বীকার করে। মৃতদেহের যথাযোগ্য সৎকার না-করা গ্রীক বিধানে পাপ। নিহতদের জননীরা এথেন্সের রাজা থেসিয়ুসেব কাছে আবেদন করে। থেসিয়ুস থিবিকে যথাযোগ্য সৎকারে বাধ্য করে। পিলোপনেশীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় এথেন্সের এই প্রাচীন পৌরাণিক গৌরবময় ভূমিকা স্মরণ করার কারণ ছিল। ঘটনা হিসাবে, থিবির সৈন্যদল দেলিয়ুসের বিজয়ের পর এথেন্সের নিহত সৈন্যদের সৎকার করতে দিতে অস্বীকার করেছিল। পৌরাণিক যুগের মতোই থিবি আর একবার গ্রীসের পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে চলেছিল। এই নাটকে ইউরিপিদিস যেন সমগ্র গ্রীসের পক্ষ হয়ে ধর্মবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

ট্রয়যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা নিয়ে ইউরিপিদিস একাধিক নাটক লিখেছিলেন। এদের মধ্যে আছে হেকুবা ও আন্দ্রোমেকি।

কিন্তু 'ট্রোয়াদ' বা ট্রয়ের নারী নাটকই অবিস্মরণীয়। সমসাময়িক যুগের পটভূমিকায় বিচার করলে এই নাটকের মহত্ত্ব বোঝা যাবে। গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ হলেও 'ট্রোয়াদ'সম্ভবত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিরোধী নাটক। 'ট্রোয়াদ' লেখা হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৪১৫ অব্দে। দীর্ঘকালের যুদ্ধে এথেন্স ক্ষতবিক্ষত, সমগ্র গ্রীস বিধ্বস্ত। প্রতি গ্রীষ্মে স্পার্টার সৈন্যবাহিনী হানা দিয়ে আটিকার প্রদেশগুলি জনহীন ও শস্যহীন করে তুলেছে। কোনোপক্ষেরই জয়লাভের লক্ষণ নেই। উদ্বাস্তু নরনারী গ্রাম ছেড়ে নগরের প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সিসিলি অভিযানের তোড়জোড় চলছে। কিন্তু এইসময় এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেল। নিরপেক্ষ মেলোসকে দলে টানতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে এথেন্স মেলোস আক্রমণ করল। সমস্ত পুরুষকে নিহত করে নারী ও শিশু-দের দাসরূপে বিক্রি করা হল। এথেন্সের গণতান্ত্রিক বিবেক সামান্য প্রতিবাদ করেই শান্ত হয়ে গেল, অথচ সামান্যকিছু আগেই মিতি-লিনের প্রতি এইধরণের আচরনের প্রতিরোধে এথেন্সের গণতান্ত্রিক বিবেক কী বিস্ময়কর দৃষ্টান্তই না স্থাপন করেছিল। মেলোসের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ স্মৃতি সামনে রেখেই ইউরিপিদিসের 'ট্রোয়াদ' রচনা।

এই নাটকের ট্রাজিক হিরো ট্রয়ের নারীরা নয়, গ্রীক সৈন্যবাহিনী। বিজয়ী গ্রীকবাহিনী মায়ামমতা, দয়াধর্ম, দেবতা—সবকিছুকে পদদলিত করেছে। বিজয়ের উল্লাসে তারা দেবমন্দির ধ্বংস করেছে, নারী শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, নিরপরাধ পলিক্‌জেনার রক্তে একি-লিসের কবর রঞ্জিত করেছে, কুমারীব্রতধারিণী উপাসিকা কাসান্দ্রাকে দেবীর মন্দির থেকে ছিনিয়ে এনেছে। গ্রীক সেনাপতিরা ভোগ করবেন বিজিত নারীদের। কিন্তু তাদের এই বিজয় নিরর্থক। ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে তারা সমুদ্রে প্রাণ হারাবে, দেশদেশান্তরে ঘুরে মরবে, অসতী স্ত্রীর অস্ত্রাঘাতে আগামেম্‌ননের শোচনীয় মৃত্যু ঘটবে, অদিসিউসের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। পুরাণের পরিচিত কাহিনী

হলেও কাসান্দ্রার মতোই ইউরিপিদিস এই নাটকে এথেন্সের ভয়ংকর ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। এক বছরের কিছু পরেই এথেন্স সিসিলি অভিযানে পরাজিত হয়েছিল। বিশাল বাহিনীর অধিকাংশই শোচনীয় মৃত্যুবরণ করেছিল, বাদবাকি সাইরাকিউসের খনিতে দাসরূপে বিক্রীত হয়েছিল। নয় বছর ব্যর্থ সংগ্রাম করার পর এথেন্সকে আত্মসমর্পণ করতে হল। লাইসান্দার এথেন্সের দুর্ভেদ্য প্রাচীর চুরমার করে দিলেন। কিন্তু তার আগেই ইউরিপিদিস দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন এবং চূড়ান্ত পরাজয়ের কিছু আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

হারকিউলিস ফিউরেনস নাটকের রচনাকাল জানা যায় না। ট্রাজিডি হিসাবে এটি অতি উচ্চাঙ্গের। হেরার বিরূপতায় উন্মত্ত হারকিউলিস কর্তৃক স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা এই নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকে বন্ধুত্বের এক অপূর্ব মহৎ চিত্র আছে। স্ত্রী ও সন্তান হত্যার গ্লানি ও পাপবোধে হারকিউলিসের মন যখন আচ্ছন্ন, তখন সামনে এল এথেন্সের রাজা বন্ধু থেসিয়ুস হারকিউলিসের হাত দু'খানা সে নিজের হাতে ধরল, কোনো গ্রীকের পক্ষে যা করা অসম্ভব। সে বলল: "তোমার পাপের সবটুকু ভাগ নিতে চাই। তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিলে পাপ আমার কাছে পাপ নয়। তুমি বাধা দিও না। আর মনে রেখো, যারা মহান তারা স্বর্গের আঘাত সহ্য করে, কখনো টলে না।" হারকিউলিস বলল, "জানো আমি কী করেছি?" থেসিউস উত্তর দিল: "তোমার বেদনা স্বর্গকে স্পর্শ করেছে....।" হারকিউলিস বলল: "প্রাণ দিয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো। পৃথিবী আমার দিকে তাকিয়ে বলবে, এই সেই মহাপাপী।" উত্তরে থেসিউস বলল: "যদি বলে, তাহলেও সহ্য করবে, সহ্য করে করে কঠিন হবে।" থেসিউস বন্ধুকে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এল। এই নাটকের যুক্তিনিষ্ঠ ইউরিপিদিস উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, নৈতিক দায়িত্ব যদি না থাকে, তাহলে রক্তপাতে অশুচিতা দৈহিক অশুচিতা মাত্র।

ইলেক্‌ত্রা লেখা হয় খ্রীঃ পূঃ ৪১৩ অব্দে। সোফোক্লিসের সঙ্গে

ইউরিপিদিসের ইলেক্‌ত্রার আকাশপাতাল প্রভেদ। এই নাটকে বাস্তবতা চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে। গ্রাম্য শ্রমজীবীর সঙ্গে ইলেক্‌ত্রার বিয়ে এবং প্রকৃত ঘরসংসারের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে ট্রাজিডির ভাবলোকে তিনি নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবতার আধিক্য নিঃসন্দেহে ইলেক্‌ত্রার ট্রাজিক গৌরবের হানি ঘটিয়েছে। সন্তান কর্তৃক মাতৃ-হত্যার বীভৎস কাহিনীর প্রতীতির জন্য বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন, যে পরিবেশ সোফোক্লিসের নাটকে আছে। ইউরিপি-দিসের ইলেক্‌ত্রা প্রকৃত ট্রাজিক নায়িকা হয়ে উঠতে পারে নি। ইলেক্‌ত্রার সূত্র ধরে রচিত অরেস্তিস নাটকও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারে নি। মাতৃহত্যায় স্থিরলক্ষ্য অরেস্তিস এই নাটকে ষড়যন্ত্রকারীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অরেস্তিসে নাটকীয় গুণ বহুলাংশে বর্তমান। ইউরিপিদিস যেন পৌরাণিক ভাবলোকের পরিবর্তন ঘটিয়ে এইযুগে নতুন ধরনের ট্রাজিডির পরীক্ষা করতে চেয়েছেন।

পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে নাটক রচনায় ইউরিপিদসি যতখানি স্বাধীনতা দেখিয়েছেন আর কোনো নাট্যকার ততখানি দেখাতে পারেন নি। পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে স্বাধীন কল্পনার আশ্রয়ে যে কয়েকখানি নাটক লিখেছেন তার মধ্যে হেলেনা অন্যতম (খ্রীঃ পূঃ ৪১২)। এই নাটকে হেলেন সম্পর্কে তিনি এক অভিনব কাহিনীর অবতারণা করেছেন। নিছক নাটক হিসাবে হেলেন উচ্চাঙ্গের, কাহিনীর বিনাসকৌশলটি সুচতুর। আন্দ্রোমিদা নামে অপর একটি নাটকের সঙ্গে হেলেনা প্রদর্শিত হয়েছিল। ইফিজিনিয়া এন তরিস নাটকখানিও একই গোত্রের। আরিস্টটল জটিল প্লট আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার এই নাটকখানি উল্লেখ করেছেন। ইফিজিনিয়ার পূর্বকাহিনী নিয়ে রচিত ইফিজিনিয়া এন অলিদ মৃত্যুর কিছু আগে লেখা। ইস্কাইলাসের সেপ্তেমের কাহিনী নিয়ে তিনি যে ফোনিসাই নাটক লিখেছিলিন তা মধ্যযুগের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য নির্বাচিত নয়খানি নাটকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আইওনের রচনার তারিখ জানা যায় না। এই নাটকেও ইউরিপিদিস প্রচলিত কাহিনীতে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। কাহিনীর জটিল বিন্যাসকৌশলে আইওন ইউরিপিদিসের নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নাটকে তিনি আপোলোর দৈববাণী সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে আপোলো আর ধর্মের প্রতিনিধি নয়, একটি রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মাত্র। আপোলোর দেলফি এথেন্সের বিরুদ্ধবাদী, তার মন্দির স্বার্থ, ক্ষমতা, ষড়যন্ত্র ও কুসংস্কারের কেন্দ্রস্থল। দেলফির আপোলো মন্দিরের এই ভূমিকা সোফোক্লিসের চোখেও ধরা পড়েছিল, কিন্তু গভীর ধর্মবোধে আচ্ছন্ন সোফোক্লিস এর অন্যরকম ভাষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, আপোলো খাঁটি, কিন্তু তার দৈববাণী যারা ব্যাখ্যা করে দোষ তাদেরই। কিন্তু ইউরিপিদিসের সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না।

ইউরিপিদিসের শ্রেষ্ঠ নাটক বাক্‌খাই মৃত্যুর পর প্রদর্শিত হয়েছিল। পীড়িত ও ব্যথিত শিল্পী এথেন্সের কৃত্রিম নাগরিক সভ্যতার বিষাক্ত পরিবেশ থেকে বহুদূরে পর্বতবন্ধুর প্রদেশের আদিম জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে যেন নতুন করে নিজেকে শেষবারের মতো আবিষ্কার করেছিলেন। বাক্‌খাই তাঁর পরিণত শিল্পবোধের ও কবিত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন।

দেবতা দিওনিসাসের বহুবিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি অংশ বাক্‌খাই-র বিষয়বস্তু। আগেভের পুত্র থিবির রাজা পেনথিউস দিওনিসাসের পূজা অস্বীকার করেছিল। দিওনিসাস আগেভসহ থিবির সমস্ত নারীদের নিজের ভক্ত-উপাসিকার দলে পরিণত করল। তারা রাত্রে নগরের বাইরে আত্মবিস্মৃত হয়ে অরণ্যপ্রদেশের নির্জনতায়, পুরুষের কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে গোপন অভিচার-ক্রিয়া করতো। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে রাজা পেনথিউস নারীবেশে সেই ক্রিয়া দেখতে গিয়ে উপাসিকাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হল। আত্মবিস্মৃতা আগেভ পুত্রের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে ঘরে ফিরল।

বাক্‌খাই-র ফলশ্রুতি নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে; কেউ কেউ বলেছেন, এই নাটকে দেবমহিমার প্রতিষ্ঠা করে ইউরিপিদিস প্রচলিত দেবতাদের সম্পর্কে তাঁর সংশয়বাদের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। কেউ কেউ একে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মানসিক প্রবণতার দিক থেকে। এথেন্সের তথা সমগ্র গ্রীসের ছিন্নমস্তা সভ্যতার পরিবেশ থেকে ইউরিপিদিস পলায়ন করেছিলেন মাসিদনে। বাস্তব জগৎ ও জীবনের বিরোধিতার রহস্য খুঁজে খুঁজে তিনি একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পর্বত ও অরণ্যবেষ্টিত মাসিদনের স্তব্ধ গম্ভীর সৌন্দর্য ও আদিম অনিয়ন্ত্রিত জীবনের রহস্য তাঁর মনে নিঃসন্দেহে গভীর মিস্টিক প্রবণতা এনেছিল। পদে পদে খণ্ডিত সভ্য ও নিয়ন্ত্রিত জীবনের শত নৈরাশ্য ও বেদনাবিক্ষোভের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে দিঅনিসাসের সাধনার মতো মিস্টিক সাধনা আর নেই। দিঅনিসাসের সাধকেরা বলে: সভ্যতা ব্যাধিগ্রস্ত, সভ্যতা থেকে দূরে চলে এসো, চলে এসো এই বনপ্রকৃতি, পাহাড়, ঝরনার উদার প্রাঙ্গণে; জীবনে প্রচলিত আদর্শগুলি আপেক্ষিক। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আবিষ্কার করো মানসিক স্থৈর্য। কুৎসিত ও অসুন্দরকে সৃষ্টি করেছে সভ্যতা। এই আদিম পরিবেশে আবিষ্কার করো দেবতার অস্তিত্ব। ক্লান্ত পীড়িত ইউরিপিদিস নিঃসন্দেহে এই সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনে এই তথাকথিত প্রবণতার ব্যর্থতার দিকটিও ধরা পড়েছিল। সভ্যতাকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাময়িক পলায়ন সম্ভব, তা লোভনীয়ও বটে, কিন্তু তার পরিণতি কী? পরিণতি এক যুক্তিহীন উন্মত্ততায়। ফলে, সৌন্দর্য ও শান্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধি সমাজমূল থেকে বিচ্যুত হয়। তা হয় সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত, নীতিহীন (amoral); সর্বোপরি, তা পরিণত হয় এক সঙ্ঘবদ্ধ হিংস্রতায়। তার চূড়ান্ত রূপও দিঅনিসাসের সাধনায়। সুতরাং যা লাভ হয়, তা অতি ভয়ংকর। সারা রাত্রি দেবতার সান্নিধ্য লাভের

পর যখন আগেভ ফিরে আসে, তখন বয়ে আনে নিজের পুত্রের ছিন্নমুণ্ড।

ইউরিপিদিস ছিলেন ইস্কাইলাসের মতোই সমাজসচেতন শিল্পী। কিন্তু দুজনের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। প্রচলিত ধর্ম ও দেবতাকে ইস্কাইলাস অগ্রাহ্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি নতুন করে দেবতাদের গড়ে নিয়েছিলেন। এথেন্সের সমাজ ও রাষ্ট্রকে যাঁরা বিরাট আদর্শের ভিত্তির উপর গড়ে তুলেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। পরবর্তী অবক্ষয়ের যুগে ইউরিপিদিস প্রচলিত ধর্ম ও দেবতাদের আক্রমণ করলেও নতুন করে গড়ে তোলার সাধ্য তাঁর ছিল না। তাই বলিষ্ঠ আশাবাদ নয়, গভীর বেদনাবোধই ইউরিপিদিসের মূল কথা। সমাজ ও রাষ্ট্রের আপাত গৌরবের উজ্জ্বলতা তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। যুদ্ধের মধ্যে তিনি দেখেছেন ন্যায় ও ধর্মের অবমাননা, মানবতার অসম্মান। সমাজের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন ক্রীতদাসের ভয়ার্ত মুখ, অবমানিত নারীত্বের হৃদয়বিক্ষোভ। যত অকিঞ্চিৎকর, যত হতভাগ্যই হোক, মানুষমাত্রেরই মূল্য আছে, জীবনের মূল্য আছে—ইউরিপিদিসের এই বোধটি সদাজগ্রত ছিল। এইজন্যই তিনি এতো আধুনিক।

ইউরিপিদিসের গভীর বেদনাবোধই জন্ম দিয়েছে নৈরাশ্যবাদের। তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার অপ্রতিরোধ্যশক্তি তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে জাগতিক শক্তি রূপে। সে শক্তি নির্মম, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। মানুষের হৃদয়বেদনা সে শক্তির কাছে মূল্যহীন। সে শক্তি মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচারণ করে। কিন্তু তবুও মানুষ জীবনে মহৎ বৃত্তিগুলির অনুশীলন করে। মহত্ত্ব, বন্ধুত্ব, দয়া, সহনশীলতা মানুষেরই ধর্ম। পরাজয় সত্ত্বেও মানুষ পীড়ন সহ্য করে, বেদনাকে গ্রহণ করে। মানুষ যখন বীরের মতো সহ্য করে, তখন বেদনার সৌন্দর্য এই হৃদয়হীন সংসারে তাকে মহৎ করে তোলে। এই জন্যই ইউরিপিদিস "জগতের বেদনার কবি"। এইজন্য আরিস্টটল

বলেছিলেন, "সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে ট্র্যাজিক।".

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী গ্রীক ট্র্যাজিডির স্বর্ণযুগ। এযুগে এবং পরবর্তী যুগে বহু নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস ও ইউরিপিদিসের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মান এতো বেশি ছিল যে আর সবাই আড়ালে পড়ে গেছেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের সাহিত্যে সমালোচনায় এই তিনজনকেই ট্র্যাজিডির প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এঁদের রচনায় যাতে কোনো রকম স্থূল হস্তাবলেপ না হয়, কোনো অভিনেতা যাতে কোনো কথা বা বাক্যের অদলবদল না করে, মঞ্চের সুবিধা অথবা অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাটকে কোনো সংশোধন বা পরিবর্তন না ঘটানো হয়, তার জন্য সরকারী আইন পাস করা হয়েছিল। আইন করে এঁদের নাটকের রচনার প্রামাণ্য সংস্করণ সরকারী দপ্তরে রাখা হয়েছিল। যখনই এঁদের কোনো নাটক অভিনীত হতো, কোনো রাজকর্মচারী প্রামাণ্য সংস্করণ নিয়ে নাট্যশালায় হাজির হতো এবং প্রতিটি শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতো, যাতে তিলমাত্র বিচ্যুতি না ঘটে। এমনই ছিল মহাকবিদের সম্মান।

একথা সত্য যে. এঁদের সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের বেশির ভাগ নাট্যকারের প্রতিভা ছিল নিম্নস্তরের। তবু কয়েকজনের কিছুটা বিশেষত্ব ছিল। এঁদের মধ্যে আইওন, আকাউস ও আগাথনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আইওন ইস্কাইলাস, সোফোক্লিসের বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। ট্র্যাজিডি ছাড়া তিনি কমেডিও লিখেছিলেন, যা কোনো নাট্যকার করেন নি। বহু স্মৃতিকথা, গীতি-কাব্য ও ভ্রমণকাহিনীরও তিনি লেখক। আকাউসের নাম সাতুর-নাটক রচনায়, এ ব্যাপারে তাঁর স্থান নাকি ইস্কাইলাসের পরেই।

গ্রীক নাট্যকারদের নাটক অভিনয়ের ও পরিচালনার ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হতো। যিনি নাট্যকার তিনিই প্রধান নট এবং পরিচালক ছিলেন। এরই ফলে নাট্যরচনা, পরিচালনা এবং অভিনয়ের একটা পারিবারিক গোষ্ঠী গড়ে উঠতো। নাটক রচনার প্রতিভা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু বংশানুক্রমিকভাবে অভিনয়ের অন্যান্য ব্যাপারের একটা ঐতিহ্য গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। গ্রীসে বহু নাট্যকারের বংশে এই ঐতিহ্যই গড়ে উঠেছিল। ফ্রানিকাসের পুত্র পলিক্রাদস, প্রাতিনাসের পুত্র আরিসতিয়াস নাটক লিখে অল্পবিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রায় দুশো বছর ধরে ইস্কাইলাসের বংশে এই ঐতিহ্য জীবন্ত ছিল, তাঁর দুই পুত্র ইউফোরিঅন ও বিওন দুজনেই ট্রাজিডি রচনা করেছেন। বিশেষ আইনের বলে বিওন পিতার নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামবার অধিকার পেয়েছিলেন। ইস্কাইলাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিলোক্লিসের খ্যাতি ছিল সমধিক, কারণ তিনি একবার সোফোক্লিসকে পরাজিত করেছিলেন। ফিলোক্লিসের পুত্রও নাট্যকার ছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে একদল নতুন নাট্যকার নাট্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। আগেকার নাট্যকারদের মতো ট্রাজিডি রচনা ও পরিচালনা এঁদের পেশা নয়। এঁদের বলা যেতে পারে অপেশাদার নাট্যকার। এঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে সোক্রাতিসের শিষ্য ক্রিতিয়াসের। মিলোতিউসের প্রসিদ্ধি অন্য কারণে। সোক্রাতিসের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ট্রাজিক কবিদের পক্ষ থেকেই তিনি অভিযোগ এনেছিলেন। সোক্রাতিসের মৃত্যুদণ্ডের কিছু পরে তিনিও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আরিস্তারকাস ছিলেন ইউরিপিদিসের সমসাময়িক। ট্রাজিডির দৈর্ঘ্যের সীমা নির্দিষ্ট করার জন্য তাঁর খ্যাতি। সাইকিওনের নিওফোনও অনেক নাটক লিখেছিলেন। স্থেনেলিউসের ট্রাজিডি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন আরিস্টটল। তিনি ট্রাজিডির ভাষাকে

একেবারে সাধারণ মানুষের ভাষায় পরিবর্তন করে ফেলতেন, এই-জন্য তাঁর নাটক সাফল্য লাভ করতে পারে নি। এঁরা ছাড়াও নাথিপ্‌সা, আসেস্তর, থিওগোনিস, নেসিপ্‌পাস প্রভৃতি ট্রাজিডি লেখকদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেও এথেন্সে ট্রাজিডি রচনায় ভাটা পড়ে নি। গ্রীক ট্রাজিডি দূরদূরান্তের উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়লেও এথেন্স তখনো ছিল নাট্যজগতের প্রাণকেন্দ্র। দিঅনিসাসের বাৎসরিক উৎসব অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হলেও এথেন্সের উৎসবের খ্যাতি ছিল ভুবনবিখ্যাত। দূরদূরান্ত থেকে কবিযশপ্রার্থী বিদেশীরা এথেন্সে এসে বাস করতেন নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য। পঞ্চম শতাব্দীতেই একাধিক বিদেশী কবি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এযুগের এথেন্সের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইস্কাইলাস প্রমুখ পুরাতন নাট্যকারদের নাটক মুখস্থ করার আগ্রহ, পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা। অসংখ্য অভিনেতা পুরাতন নাটক অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এতো অল্পকালের মধ্যে ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হবার গৌরব অন্য কোনো দেশের কবিদের ভাগ্যে খুব কমই জুটেছে। অপরদিকে নগর-দিঅনিসিয়া ও লেনিয়ার উৎসবের চাহিদা মেটাতে নাট্যকারেরা অসংখ্য নাটক লিখেছেন। শোনা যায়, এক কারনি-কাসই নাকি একশো ষাটখানি নাটক লিখেছিলেন, আস্ত্রিদামাস লিখেছিলেন একশো চল্লিশখানি।

কিন্তু এযুগের নাট্যকারদের প্রতিভার অভাব ছিল। এযুগের সমস্ত নাটকই গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা। মৌলিকতা বা নতুন সৃষ্টির ক্ষমতা কোনো নাট্যকারেরই ছিল না। পুরাণ মন্থন করে নতুন কাহিনী পরিবেশন করা আর সম্ভব ছিল না, নতুনত্বের দিকেও দৃষ্টি ছিল না। এথেন্সের জাতীয় জীবনের চরম অবক্ষয় নাট্যজগতেও সংক্রামিত হয়েছিল। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে সামগ্রিক ঐক্যবোধে

সার্থক নাটক সৃষ্টি হয়, এথেন্সে তার সমাধি ঘটেছিল। এখন তাই শুধু পুরাতনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রোমন্থন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। যাঁরা নতুনত্বের চেষ্টা করেছিলেন তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নাটককে বাঁচতে হলে রাষ্ট্রে ও সমাজে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করা চাই। কিন্তু এথেন্সে এই প্রাণশক্তি আর কখনো সঞ্চারিত হয় নি, তাই গ্রীক ট্রাজিডিও বাঁচে নি।

গ্রীক ট্রাজিডি না-বাঁচার অপর একটি কারণ তার কঠোর ধর্মীয় বাতাবরণ। ধর্মের বেদী থেকে ট্রাজিডির জন্ম হয়েছিল। ট্রাজিডি লেখা, অভিনয় করা, দেখা সবই ধর্মকৃত্যের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস প্রমুখ নাট্যকারদের রচনা গভীর ধর্মবোধে অনুরঞ্জিত। ট্রাজিডির বিষয়বস্তুতেও ছিল দেবদেবীর প্রাধান্য। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে এথেন্সের ধর্মবোধে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইউরিপিদিস প্রচলিত দেবতাদের দেবত্বে প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রচলিত ধর্মের প্রতি সন্দেহ প্রকাশে আনাক্জাগোরাস বিতাড়িত হয়েছিলেন, প্রোতাগোরাস তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছিলেন : "দেবতারা আছেন কি নেই, তা আমি জানতে অক্ষম।" সর্বোপরি সোক্রাতিস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। দেলফির কারচুপি সোফোক্লিস এড়িয়ে গেলেও পরবর্তীকালের এথেন্সবাসীদের কাছে তা অজানা থাকবার কথা নয়। এককথায়, প্রচলিত ধর্ম ও দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসের মূল কালক্রমে অনেক বেশি শিথিল হয়ে পড়েছিল। এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ, ট্রাজিডিকে পুরাতন ধর্মবোধ থেকে মুক্ত করার কথা কোনো কবিই ভাবতে পারেন নি। মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইউরিপিদিস সমকালের অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। তাঁর পথে অগ্রসর হবার দুঃসাহস আর কোনো নাট্যকারের হয় নি। যুগের পরিবর্তনে রুচির ও ধর্মবিশ্বাসের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেলেও নাট্যকারেরা সেই একঘেয়ে পুরাণকথা থেকে কাহিনী নির্বাচন করতেন, সেই প্রাচীন কোরাস, আনুষঙ্গিক বেশভূষার জাঁকজমক, সেই

অতিপরিচিত মুখোশ, একই প্রাচীন প্রথায় ধর্মোৎসবে অভিনয় নতুনত্বের কোনো অবকাশ নেই, নতুন সৃষ্টির পথ রুদ্ধ, সবই ধর্মের অনুশাসনে বিধিবদ্ধ। গ্রীক ট্রাজিডির সৃষ্টির প্রেরণা ধর্মবোধ থেকে, এ যেমন সত্য, ধর্মবোধই তার মৃত্যুর কারণ, এও তেমনই সত্য। অথচ ধর্মবোধ থেকে, ধর্মোৎসবের বেদী থেকে গ্রীক কমেডিরও জন্ম। কিন্তু গ্রীক কমেডির মৃত্যু ঘটে নি, নবরূপে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। ধর্মবোধের অনুশাসন কমেডিকে কোনদিনই লৌহবন্ধনে বাঁধতে পারে নি। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে ধর্মের খোলোসকে অতিসহজেই ছেড়ে আসতে পেরেছে।

চতুর্থ শতাব্দীতে একদল অলংকার-শাস্ত্রবিদ নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এঁরা অনেকেই হয় বক্তা (orator), নয়তো বক্তার শিষ্য। এঁদের হাতে ট্রাজিডি বক্তৃতার কসরতে পরিণত হয়েছিল। আরিস্টটল বলেছেন, এঁদের পাত্রপাত্রীরা আগেকার মতো মানুষের ভাষায় কথা বলে না, বলে আলংকারিকের ভাষায়। এঁদের মধ্যে আরিস্টটলের শিষ্য থিয়োদেকতিসের নামটি উল্লেখযোগ্য। এইযুগে কেবলমাত্র পাঠের জন্য কিছু কিছু ট্রাজিডি রচিত হয়েছিল। এই ধরনের 'লিটারারি' নাটক গ্রীক নাট্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। অভিনয় ব্যতীত নাটকরচনা আগের শতাব্দীতে অভাবিত ছিল। কিন্তু এইধরনের রচনা এযুগে বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল।

খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকেই ট্রাজিডি এথেন্সের বাইরে বিভিন্ন গ্রীক প্রদেশে ও উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। গ্রীক নাটকের দেবতা দিঅনিসাসের পূজা ও উৎসব গ্রীক জগতের সর্বত্রই পালিত হতো। লোকরিস, সিসিলি ও মাসিডোনিয়ায় ইতিমধ্যেই ট্রাজিডি অভিনয় প্রবর্তিত হয়েছিল। এথেন্সের স্বর্ণযুগের অবসানের পর গ্রীক উপনিবেশগুলিতে ট্রাজিডি অভিনয়ের রেওয়াজ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক উপনিবেশগুলিতে উৎসব ও অভিনয় আবশ্যিক ছিল। আলেকজাণ্ডারের

সময়ে গ্রীক ভাষাভাষী জগতের সর্বত্র এই ব্যাপারটি পুরোপুরি স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ট্রাজিডি অভিনয় আর শুধুমাত্র দিঅনিসাসের উৎসবের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে নি, অন্যান্য দেবদেবীর উৎসবেও অভিনয়ের রীতি প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী কালে এই রীতি আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। কিন্তু ট্রাজিডি কখনোই তার নিজস্ব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নি। ধর্মবর্জিত উৎসবে অভিনয় হলেও ট্রাজিডি কোনো কালেই নিছক আনন্দ বিতরণের বস্তু হয় নি, অপেশাদার বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অভিনয় করা কখনো সম্ভব হয় নি। জাতীয় ও সমষ্টিগত উদ্যোগের সমস্ত চিহ্ন গ্রীক ট্রাজিডি বজায় রেখেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রূপেও অভিনয় নির্দিষ্ট ছিল জাতীয় উৎসবে, বিজয় বা ওই ধরনের কোনো বৃহৎ সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডে। নাট্যপ্রয়োগের অধিকারী ছিল রাজা বা সেনাপতিজাতীয় রাষ্ট্রনায়ক। ধর্মনিরপেক্ষ প্রাচীন অনুষ্ঠানের নজির পাওয়া যায় খ্রীঃ পূঃ ৩৩ অব্দে। মাসিদোনিয়ার রাজা ফিলিপ কন্যার বিবাহে ট্রাজিডি অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানেই তিনি নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার নিজে অভিনয়ের ভক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিটি অভিযানের শেষে বিজয়োৎসবে তিনি অভিনয়ের আয়োজন করতেন। বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁর বাহিনীর সঙ্গে ফিরতো। বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অভিনয়-অনুষ্ঠানের জন্য আন্তিওকাসেরও খ্যাতি ছিল।

পরবর্তী কালে পশ্চিমে ফ্রান্স ও ইটালি থেকে পূবে সিরিয়া ও ফোনিসিয়া পর্যন্ত দূরদূরান্তরে গ্রীক নাটক অভিনয়ের রীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। স্পেনের প্রত্যন্ত প্রদেশেও গ্রীক ট্রাজিডি অভিনয়ের নজির মেলে। পূর্বাঞ্চলে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলে, যেখানেই গ্রীক, আধা-গ্রীক অথবা গ্রীক ভাবাপন্ন রাজারা রাজত্ব করেছিলেন, সেখানেই তাঁরা গ্রীক সভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদটি প্রচার করেছেন। খ্রীঃ পূঃ ৬৯ অব্দে আর্মেনিয়ার রাজা তিগরানেস একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য অনেক গ্রীক অভিনেতাকে দেশদেশান্তর থেকে রাজধানীতে নিয়ে

এসেছিলেন। লুকুল্লাস যখন তিগরানোসকেতা দখল করেছিলেন, তখন তাদের দেখতে পেয়েছিলেন। প্লুতার্কের বিবরণ থেকে জানা যায়, কারাহায়তে স্পার্টাকাসবিজয়ী রোমান সেনাপতি ক্রাসাস পরাজিত ও নিহত হলে পার্থিয়া এবং আর্মেনিয়ার রাজাদের পুত্র-কন্যার বিবাহের উৎসব-আয়োজন হয়। সেই উৎসবে ইউরিপিদিসের বাক্‌খাই অভিনয়ের সময় জেসন নামে এক অভিনেতা আগেভের অভিনয় করতে করতে পেনথিউসের ছিন্নমুণ্ডের বিকল্প হিসাবে নিহত ক্রাসাসের মুণ্ড নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিল।

অবশ্য এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যা থেকে বলা যেতে পারে, এই ধরনের বিবাহ বা বিজয়োৎসবে পূর্ণাঙ্গ ট্রাজিডি অভিনীত হতো। এধরনের উৎসবে পুরাতন ট্রাজিডির অংশবিশেষ অভিনয় করার একটা রীতি চতুর্থ শতাব্দীতেই গড়ে উঠেছিল, বিখ্যাত নাট্যকারদের স্মরণীয় ট্রাজিডি অভিনয়ের আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ অথবা অপ্রধান উৎসবে এঁদের ট্রাজিডি অভিনয় পরবর্তীকালে বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। পুরাতন নাট্যকারদের মধ্যে প্রথমে ইস্কাইলাস, পরে সোফোক্লিসের জনপ্রিয়তা কমে এসেছিল। কিন্তু ইউরিপিদিসের জনপ্রিয়তা বহু শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

নির্দেশিকা

গ্রীক পৌরাণিক তথ্য সম্পর্কে সহজলভ্য ভালো বই: রিবার্ট গ্রেভসের 'দি গ্রীক মিথস,' দুই খণ্ড (পেংগুইন); অস্কার সেফের্টের 'এ ডিক্‌সনারি অব দি ক্লাসিকাল মিথস' (মেরিডিয়ান লাইব্রেরি); এডিথ হ্যামিলটনের 'গ্রীক মিথস'।

গ্রীক ইতিহাস, সমাজজীবন ও নাট্যকারদের সম্পর্কে: থুকিদিদাসের 'দি পিলোপনেশিয়ান ওয়ার' (পেংগুইন); প্লুতার্কের 'রাইজ অ্যাণ্ড ফল অব এথেন্স'; এডিথ হ্যামিলটনের 'দি গ্রীক ওয়ে অব লাইফ' (পকেট বুক); জর্জ

টমসনের 'ইস্কাইলাস অ্যাণ্ড এথেন্স'; 'গিলবার্ট মারের 'ইউরিপিদিস অ্যাণ্ড হিজ টাইমস' (অক্সফোর্ড); এইচ. ডি. এফ. কিটোর 'দি গ্রীকস' (পেংগুইন)। সংক্ষেপে গ্রীক নাট্যকারদের সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা আছে শেলডন চেনের 'দি থিয়েটার' এবং জন গাসনারের 'মাস্টারস অব দি ড্রামা' বইতে।

ইস্কাইলাসের (লুইস ক্যাম্বেলের অনুবাদ) সমগ্র রচনা একসঙ্গে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক সিরিজে মিলবে; গিলবার্ট মারের অনুবাদও সহজলভ্য; সোফোক্লিসের সাতখানি এবং ইউরিপিদিসের ছয়খানি নাটকের অতি সুন্দর ওয়ালটিঙের অনুবাদ পেংগুইন গ্রন্থমালায় মিলবে। ইউরিপিদিসের সমগ্র রচনা দুইখণ্ড (পটার, উডহাল, জেব প্রভৃতির অনুবাদ) এভ্রিম্যানস লাইব্রেরির গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত।

বাংলায় একমাত্র লেখা মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'ইস্কাইলাস', 'সোফোক্লেস', 'এউরিপিদেস' নামে তিনখানি বই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ইস্কাইলাস ও সোফোক্লিসের ভূমিকা দুটি অতিশয় মূল্যবান। গ্রীক ট্রাজিডিগুলির গল্প ও মোটামুটি নাট্যকারদের জীবন ও নাটক সম্পর্কে সাধারণ তথ্য এই তিনখানি বইতে ভালোই পাওয়া যাবে।

গ্রীক ট্র্যাজিডির গঠন-বৈশিষ্ট্য

গ্রীক ট্র্যাজিডির কাহিনী সংগ্রহ করা হতো মুখ্যত গ্রীক পুরাণ কথা থেকে। ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে ট্র্যাজিডি রচনার নজির ইস্কাইলাসের যুগ থেকেই মেলে। পুরাণের কাহিনী নির্বাচনের মধ্যে গ্রীক মনের রক্ষণশীলতা এবং ধর্মবোধ যেমন ছিল, তেমনই ছিল দর্শকের মনে প্রতীতি উৎপাদনের প্রশ্নটি। আরিস্টটলও এইজন্যই স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণের চেয়েও প্রতীতি উৎপাদনের দিক থেকেই পুরাণকাহিনীকে সমর্থন করেছেন। পুরাণকাহিনী সাধারণ দর্শকের পরিচিত, তাই অতিসহজেই প্রতীতি উৎপাদন সম্ভব হতো।

পুরাণকাহিনী নিয়ে নাটক রচনায় নাট্যকারদের একটা বড় সুবিধাও ছিল। সাধারণভাবে জাতীয় মনোভাবের ভিত্তি হলেও গ্রীক পুরাণের বিধিবদ্ধ স্বীকৃত রূপের সঙ্গে কোনো একটি বিশেষ ধর্মমতের প্রভাব কোনোদিনই জড়িত ছিল না। প্রদেশভেদে একই কাহিনীর আবার আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল। তারই ফলে, নাট্যকাররা মূল কাঠামোটি বজায় রেখে পুরাণকাহিনীকে নিজের মতাদর্শ অনুযায়ী গড়েপিটে নিতে পারতেন। অরেস্তেয়ার কাহিনী নিয়ে ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস তিনজনেই নাটক লিখেছেন, আরও অনেকে লিখেছেন, কিন্তু প্রত্যেকের কাহিনীতেই কিছু-না কিছু পার্থক্য আছে। ভাববস্তুর দিকে থেকেও প্রত্যেকের নাটকই স্বতন্ত্র। পুরাণ থেকে কাহিনী নির্বাচনের ফলে রাজা বা রাজকীয় চরিত্র নির্বাচন করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গ্রীক

ট্রাজিডির নায়ক রাজা অথবা রাজকীয় হলেও তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে চিরন্তন মানুষটিই।

গ্রীক ট্রাজিডির কাহিনী অত্যন্ত সরল, কোনো অতিরিক্ত ঘটনা বা অপ্রাসঙ্গিকতার কোনো অবকাশ সেখানে নেই। মূল রসের তিলমাত্র বিরোধী রস কল্পনা করাও যায় না। পূর্বপ্রসঙ্গ অতি অল্প কথায় অবতারণা করে একেবারে চূড়ান্ত অবস্থাটিই মঞ্চে উপস্থিত করা হতো। কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত থাকার ফলে প্রতীতি উৎপাদনের দিক থেকে কোনো অসুবিধাই হতো না। বরং এতে দর্শকের মনে প্রথম থেকেই একটি অখণ্ড একাগ্রতার সৃষ্টি হতো। তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হতো প্রধান চরিত্র এবং ঋজুরেখ ঘটনাটির উপর। ঘটনার কঠোর ঐক্য ছিল ট্রাজিডির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রথম যুগের ট্রাজিডিতে সময়ের ঐক্যের বিশেষ অভাব ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সময়ের ঐক্য কঠোরভাবে নির্দিস্ট হয়। সার্থক নাট্যরসের দিক থেকে সময়ের ঐক্যের কঠোরতা না মেনে উপায় ছিল না। গ্রীক মঞ্চে সামনের যবনিকা বলে কিছু ছিল না। আদ্যন্ত একই পটভূমিকায় একটানা অভিনয় করে যেতে হতো। এক্ষেত্রে সময়ের ছেদ দেখানো কষ্টকর, তাতে প্রতীতি নষ্ট হবার সম্ভাবনা। সেইজন্য একটিমাত্র ঋজুরেখ ঘটনার পরিণতির সময় নির্দিস্ট হয়েছিল এক দিন বা চব্বিশ ঘণ্টা। কাহিনীর মধ্যকার প্রাসঙ্গিক দু-তিন দিনের ঘটনাকে সংহত করে আনতে হতো। সময়ের এই ঐক্যের অভাব ইস্কাইলাসের অনেক নাটকে আছে। এই রীতির কঠোরতা তার পরের যুগে ধীরে ধীরে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এই রীতির সার্থক প্রয়োগ সোফোক্লিসের নাটকগুলিতে। সময়ের ঐক্যের মতো স্থানের ঐক্যও গ্রীক ট্রাজিডিতে কঠোরভাবে নির্দিস্ট। দু-একখানি নাটক ছাড়া স্থানের ঐক্যের অভাব সাধারণত কোনো নাটকে মিলবে না।

গ্রীক ট্রাজিডির এইধরনের বিশিস্ট গঠনের মূলে ছিল কোরাসের

ভূমিকা। পূর্ণ নাট্যগুণসম্পন্ন ট্রাজিডি সৃষ্টির আগে কোরাসের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। প্রথমে একটি নট সৃষ্টি হয়েছিল শুধু কোরাসের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য, পরে দ্বিতীয় নট সৃষ্টি হয়েছিল কোরাসের বক্তব্যকে নাটকীয়ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, তৃতীয় নটের সৃষ্টিতে নাটকীয় ব্যাখ্যা সুনির্দিষ্ট নাটকীয় রূপ পেয়েছিল। এই বিবর্তনের পর্যায়গুলিতে কোরাসের ভূমিকার পরিবর্তন হলেও তাকে বর্জন করা কখনো সম্ভব হয় নি। কোরাস শেষদিন পর্যন্ত টিকে ছিল। কোরাসের প্রবেশ দিয়ে ট্রাজিডি শুরু হতো, কোরাসের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তা শেষ হতো। নাটকের ঘটনা অভিনীত হবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে কোরাসের উপস্থিতি আবশ্যিক ও অপরিহার্য ছিল। ঘটনার গতিপথেও কোরাস অংশগ্রহণ করতো। বিশেষ করে সংগীতের মধ্য দিয়ে কোরাস দৃশ্যান্তরের ছেদগুলি সংযুক্ত করে রাখতো। কোরাসের উপস্থিতিতে স্থান ও কালের পরিবর্তনটি দেখানো সম্ভব নয়। কোরাসের ভূমিকা ছিল নাটকের বিষয়গত, কাহিনীর পাত্রপাত্রীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ইউমেনি-দাই-তে ট্রয়ের বন্দিনীদের কোরাস, অদিপাস তিরান্নোস-এ থিবির প্রধানদের কোরাস, ট্রোয়াদ-এ ট্রয়ের বন্দিনীদের কোরাস, বাক্‌খাই-তে দিঅনিসাসের উপাসিকাদের কোরাস। কোরাসকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, নিরবছিন্ন উপস্থিতিতে কালের পরি-বর্তন দেখানোও কঠিন। তাই বাধ্য হয়ে নাট্যকারদের স্থান-কালের ঐক্য কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। স্থান ও কালের পরিবর্তনের বিরল দৃষ্টান্ত মিলবে ইস্কাইলাসের ইউমেনিদাই এবং সোফো-ক্লিসের আজাক্‌স নাটকে। ইউমেনিদাই-তে মাতৃকাগণ দেলফি থেকে অরেস্তিয়াকে অনুসরণ করে এথেন্সে এসেছে, আর আজাক্‌স-এ কোরাস এসেছে শিবির থেকে সমুদ্রতীরে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলেও দুটি নাটকে নাটকীয় প্রতীতি এমন কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নি। মাতৃকাগণের একমাত্র কাজ অরেস্তিয়াকে দেশ থেকে দেশান্তরে অনুসরণ করা।

আরগস থেকে তারা অনুসরণ করে এসেছে দেলফিতে, তাই দেলফি থেকে অনুসরণ করতে করতে এথেন্সে এসে উপস্থিত হওয়া তাদের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আজাক্স-এও শিবিরে থেকে সমুদ্র-তীরের দূরত্ব বেশি নয়। ঘটনার ঐক্যের জন্যও মুখ্যত কোরাস দায়ী। প্রথম দিকে কোরাস ছিল মুখ্য, নটের ভূমিকা গৌণ। বহুদিন নটের সংখ্যা ছিল দুই, পরে তিন। এই তিনই সর্বশেষ নির্দিষ্ট সংখ্যা। এখানে দুই বা তিন নট বলতে বুঝতে হবে, নাটকের পাত্রপাত্রীর সংখ্যা নয়, মঞ্চে উপস্থিত কথোপকথনে নিযুক্ত চরিত্রের সংখ্যা। মঞ্চে উপস্থিত তিনজনের সংলাপের বাইরে ঘটনাকে বিস্তৃত করার আর কোনো উপায় ছিল না। আর এই রীতি, পরবর্তী কালে কোরাসের ভূমিকা গৌণ হলেও, নাট্যকাররা নির্বিবাদে মেনে চলেছেন। এই রীতি লঙ্ঘন না করার অনেক কারণ হতে পারে, কিন্তু মূল কারণ যে গ্রীক মনের রক্ষণশীলতা তাতে সন্দেহের অবকাশ কম।

আঙ্গিকের দিক থেকে গ্রীক ট্রাজিডির দুটি ভাগ—পাত্রপাত্রীর সংলাপ এবং কোরাসের সংগীত। আধুনিক নাটকের মতো পাত্র-পাত্রীর নিরবচ্ছিন্ন সংলাপ এতে নেই। পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাঝে মাঝে কোরাসের সংগীত। কোরাসের সংগীতের মধ্য দিয়ে দৃশ্যান্তরের প্রস্তাবনা। কিন্তু এই ব্যাপারে খুব বেশি কঠোরতা মানা হতো না। কখনো কখনো কোরাস ও পাত্রপাত্রীর মধ্যেও সংলাপ চলতো, আবার আবেগঘন মুহূর্তে পাত্রপাত্রীও কোরাসের সঙ্গে গান গাইতো। নাটকীয় সংলাপ ও সংগীতসমন্বিত রূপই ছিল ট্রাজিডির অঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য।

সংলাপের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিবৃতিমূলক উক্তির প্রাধান্য চিরকালই ট্রাজিডিতে ছিল। দীর্ঘ বিবৃতি অনাটকীয় হলেও বিশেষ কয়েকটি কারণে ব্যতিক্রম ঘটানো সম্ভব হয় নি। মঞ্চের উপর খুব বেশি 'অ্যাক্শান', বিশেষ করে মৃত্যু অথবা ভয়ংকর কোনো দৃশ্য দেখানো গ্রীক রুচিতে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। অথচ ট্রাজিডির কাহিনীতে এই

ধরনের ঘটনারই বাহুল্য। তাই এইধরনের ঘটনার যথাযথ'এফেক্‌টের' জন্য দীর্ঘ বর্ণনাবহুল উক্তির আশ্রয় নিতে হতো। এই দীর্ঘ সংলাপ-গুলি ট্রাজিডির আদিম রূপের চিহ্নও বটে। রক্ষণশীল গ্রীক নাট্যকার ও দর্শকেরা পুরনো পদ্ধতি বর্জনেও খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। কোরাসের উপস্থিতির জন্য পাত্রপাত্রীর পক্ষে স্বগতোক্তি-জনান্তিকেরও সুযোগ ছিল না। স্বগতোক্তি ব্যতিরেকে চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও মানসিক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করা কঠিন। স্বগতোক্তির অভাব পূরণ হতো মুখ্যত বিপরীত লক্ষণা দিয়ে। এই বিপরীত লক্ষণা বা 'আয়রনির' শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ সোফোক্লিসের নাটকগুলিতে।

পাত্রপাত্রীর সংলাপের কিছুক্ষণ পর পর কোরাসের সংগীত। এই সংগীত দিয়ে ঘটনার বিভিন্ন অংশ ভাগ করা হতো। পর পর বিভক্ত অংশগুলিকে নাটকের বিভিন্ন অঙ্ক বলা চলতে পারে। তবে আধুনিক অর্থে এগুলিকে অঙ্ক না বলে দৃশ্য বলাই উচিত। কারণ, বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে সাধারণত যে ধরনের বিবৃতি থাকে, গ্রীক ট্রাজিডিতে সে ধরনের বিরতির অবকাশ ছিল না। সর্বোপরি, স্থান পরিবর্তনেরও গুরুতর প্রশ্ন ছিল না। আর এই বিভিন্ন অংশের মধ্যেও দৈর্ঘ্যের কোনো সমতা ছিল না, কোনো কোনো অংশ দুশো থেকে তিনশো লাইন পর্যন্ত দীর্ঘ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরাসের সংগীতের সময় পাত্র বা পাত্রী উপস্থিত থাকতো, কখনো বা কোরাসের সঙ্গে সংগীতের অংশ গ্রহণ করতো। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এই ধরনের অংশ বা দৃশ্যের কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। তবে সাধারণত পাচটি দৃশ্যই রীতিগ্রাহ্য ছিল। ইস্কাইলাসের পার্সি নাটকের দৃশ্যের সংখ্যা চার, সোফোক্লিসের কোলোনাসে অদিপাস নাটকের দৃশ্যসংখ্যা সাত। পরবর্তীকালে এই পঞ্চ অঙ্ক বা দৃশ্যের রীতি নির্দিষ্ট হয় নিউ-কমেডির যুগ থেকে।

কোরাসের ভূমিকায় ক্রমাবনতির ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্ক বা দৃশ্যের আত্মপ্রকাশ জড়িত। পুরনো যুগের ট্রাজিডিতে কোরাসের

ভূমিকার গুরুত্ব থাকায় খুব স্পষ্টভাবে দৃশ্য ভাগ করা যায় না এবং ঘটনার গতিতেও কোরাসের সংগীত কোনো ছেদ ফেলে না। পরের যুগে কোরাসের ভূমিকা একেবারে অপ্রধান হয়ে পড়লে কোরাসের সংগীত সাংগীতিক-বিরতিতে পরিণত হয়। তখন থেকেই সত্যিকারের পঞ্চাঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই অঙ্ক বিভাগ গ্রীক নিউ-কমেডিতে প্রতিষ্ঠিত রীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। গ্রীক নিউ-কমেডি থেকে অনুকরণ করেছিলেন ল্যাটিন নাট্যকার প্লতাস এবং তেরেন্স।

ট্রাজিডির প্রথম অঙ্ক বা দৃশ্যের নাম 'প্রোলোগ' বা প্রস্তাবনা। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর নাটকগুলি ছিল সম্পূর্ণ সংগীতমূলক। থেসপিস নটের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সংগীত প্রবাহকে খণ্ডিত করে সংলাপের প্রবর্তন করেন। তাঁর নটের প্রথম কাজ ছিল কোরাসের প্রবেশের আগে বিবৃতির মধ্য দিয়ে নাটকীয় ঘটনার প্রস্তাবনা করা। নটের এই বিবৃতি 'প্রোলোগ' নামে গ্রীক ট্রাজিডির প্রথম দৃশ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। ইস্কাইলাসের ট্রাজিডিগুলির বিবৃতিমূলক প্রোলোগ সহজ ও সরল। একমাত্র তাঁর প্রমিথিয়া শুরু হয়েছে প্রথম থেকে সংলাপ দিয়ে। সোফোক্লিস সর্বত্রই এই সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনার কৌশল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইউরিপিদিস পুরনো বিবৃতিমূলক প্রোলোগ নতুন করে প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রোলোগের সঙ্গে নাটকের কাহিনীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তবে পরের যুগের নিউ-কমেডিতে এর ব্যবহার কমে গিয়েছিল। এমন কি, প্রোলোগের বক্তা নাটকের পাত্রপাত্রীর বহির্ভূত একজন হিসাবে স্বীকৃত হতো। ফলে, যে-প্রোলোগ ছিল একটি সমগ্র দৃশ্য, তা হয়ে দাঁড়ায় নাটকের প্রারম্ভিক পৃথক ভূমিকা মাত্র।

প্রোলোগের পরবর্তী দৃশ্যগুলির নাম 'এপেইসোদিয়া'। কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে: কোরাসের প্রবেশের পরবর্তী ঘটনা। সর্বশেষ দৃশ্যের নাম 'এক্‌জোদাস'। প্রথম যুগে কোরাসের প্রস্থানে নাটক শেষ হতো। সমবেত সংগীত গাইতে গাইতে কোরাসের প্রস্থান দিয়ে

ইস্কাইলাসের একাধিক নাটক শেষ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে এই নিয়ম যথাযথ মানা হতো না, কিন্তু মানা না হলেও সমগ্র দৃশ্যটিকে এই নামেই অভিহিত করা হতো। ইউরিপিদিসের এপিলোগ (ভরত বাক্য ?) ছিল নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই এপিলোগ ছিল সাধারণত দৈবযন্ত্র বা deus ex machina-র* বক্তৃতা। কিন্তু পরবর্তী কালের নিউ-কমেড়িতে প্রোলোগের মতোই এপিলোগ নাটকের কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভরতবাক্যে পরিণত হয়।

গ্রীক ট্রাজিডির সংগীতাংশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক কোরাসের সংগীত; দুই, পাত্রপাত্রীর সহযোগে কোরাসের সংগীত; তিন, পাত্র বা পাত্রীর সংগীত। কোরাসের সংগীতের মধ্য দিয়েই দৃশ্যান্তরের সূচনা। দুই দৃশ্যের মধ্যকার বিরতিটুকু কোরাসের সংগীত দিয়েই বোঝানো হতো। যে-সংগীত গাইতে গাইতে কোরাস প্রবেশ করে তার নাম 'পারোদাস' বা প্রবেশসংগীত। অনেক সময় কোরাস নিঃশব্দে প্রবেশ করে যথানির্দিষ্ট স্থান গ্রহণের পরও গাইতো। যেমন, ইউরিপিদিসের সাপলিস্ নাটকে, সোফোক্লিসের ফিলোক-তেতিস নাটকে। সাধারণত পারোদাস ছিল সমগ্র কোরাসেরই সংগীত। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। অনেক সময় একাধিক দলে ভাগ হয়েও কোরাসের সংগীত হতো। এতে নাটকীয় 'এফেক্ট' সম্ভব হতো। কোরাস একেবারে মঞ্চ ছেড়ে গিয়ে আবার ঢুকে সংগীত শুরু করলে, তাকে বলা হতো 'এপি-পারোদাস'। কিন্তু এপি-পারোদাসকে প্রায় সর্বত্র সতর্কভাবে বর্জনের চেষ্টা হতো। ইস্কাই-লাসের ইউমেনিদাসে এপি-পারোদাসের দৃষ্টান্ত আছে। এই নাটকে মাতৃকাদের কোরাস দেলফিতে প্রস্থান করে আবার এথেন্সে প্রবেশ করেছে। কোরাস প্রবেশসংগীত গেয়ে ঢোকার পর থেকে যে

---

* আক্ষরিক অর্থ 'যন্ত্রচালিত দেবতা'। দৃশ্যের মাঝখানে যন্ত্রচালিত দেবতার আবির্ভাব এবং ঘটনায় হস্তক্ষেপ। তা থেকে অর্থ: ট্রাজিক পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত মিলনাত্মক পরিণতি ঘটানো।

সব গান গাইতো তার নাম 'স্তাসিমা'। কোরাসের সংগীতের সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গির নাচ চিরকাল যুক্ত ছিল, তবে পরের দিকে নাচের অংশ অনেক কমে আসে। কোরাসের সংগীতপরিচালনা ছিল দীর্ঘদিনের অনুশীলন ও দক্ষতা সাপেক্ষ।

পাত্রপাত্রীর সহযোগে কোরাসের সংগীতের নাম 'কোমাস'। এরও নানা প্রকার রূপ ছিল। কখনো পাত্রপাত্রী কোরাসের সঙ্গে গাইতো, কখনো একবার কোরাস, একবার পাত্র বা পাত্রী—এইভাবে কোমাস গাওয়া হতো। এই ধরনের সংগীতে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। প্রথম দিকে মাত্র একজন এই কোমাসে অংশ নিতো, পরে দুজন তিনজনও অংশ নিতো।

পাত্র বা পাত্রীর একক সংগীতের নাম 'মোনোদি'। দু'তিন জন মিলে গাইলে তাকে বলা হতো 'দিওলোগ' বা সংগীত-সংলাপ। ইউরিপিদিসের নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য তাদের মোনোদির জন্য। কোরাসকে অপ্রধান করে তিনি মোনোদিকে চরম উৎকর্ষ দান করেছিলেন। প্লুতার্ক বলেছেন, ইউরিপিদিসের ইলেকৃত্রার একটি মোনোদি শুনেই এথেন্সের চিরবৈরী লাইসেন্দারের লৌহহৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল, আর তারই জন্য এথেন্সকে মাটির বুক থেকে মুছে দেবার আয়োজনের পূর্বমুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন, এথেন্স হোমারের ট্রয়ের মতো নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

সংস্কৃত নাটকের জন্মকাল

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের জন্মের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বর্ণনাটি এই রকম :

কৃত ও ত্রেতাযুগের পর কলিযুগে মানুষ যখন গ্রাম্য ধর্মে প্রবৃত্ত হয়ে কাম ও লোভের বশবর্তী হল, তাদের সুখ হল বেদনামিশ্রিত। তখন একদিন ইন্দ্রের নেতৃত্বে জম্বুদ্বীপের সমস্ত দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও উরসেরা ব্রহ্মাকে গিয়ে বলল : আমরা ক্রীড়ার জন্য এমন কিছু চাই, যা দৃশ্য এবং শ্রব্য হবে। শূদ্রদের বেদশ্রবণে অধিকার নেই, তাই এমন একটি বেদ রচনা করুন যাতে সকল বর্ণেরই অধিকার থাকবে।

তখন ব্রহ্মা মনে মনে ভাবলেন : ইতিহাস নিয়ে আমি পঞ্চম বেদ রচনা করব, তা ধর্ম, অর্থ ও যশের সহায়ক হবে, তাতে সর্বশাস্ত্রের অর্থ থাকবে এবং তা সর্বশিল্প প্রদর্শন করবে। এই ভেবে, তিনি ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে নাট্যবেদ রচনা করলেন। তারপর ইতিহাস আশ্রয় করে যোগ্য দেবতাদের নিয়ে নাটক অভিনয় করতে ইন্দ্রকে আদেশ করলেন। কিন্তু ইন্দ্র জানালেন, দেবতারা নাট্যকর্মে অশক্ত, তারা এ গ্রহণ, ধারণ ও প্রয়োগ করতে পারবে না। তখন ইন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মা ভরতকে তাঁর শত পুত্রদের নিয়ে নাট্য-বেদ প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে নাট্যবিদ্যা শিখে ভরত ইন্দ্রের 'ধ্বজমহ উৎসবে দৈত্যদের পরাজয় এবং দেবতাদের বিজয় সম্পর্কিত

নাট্যাভিনয় করেন। অভিনয় কালে অসুরেরা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র ধ্বজদণ্ড দিয়ে তাদের জর্জরিত করেন এবং ব্রহ্মা তাদের শান্ত করেন। বিশ্বকর্মা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন। ভরত ব্রহ্মাকৃত 'অমৃতমন্থন' সমবকার অভিনয় করলে সমবেত দেবতারা আনন্দ লাভ করেন এবং ব্রহ্মার নির্দেশে হিমালয়ে শিবের সম্মুখে এই সমবকার এবং 'ত্রিপুরদাহ' ডিম পুনরায় অভিনীত হয়। শিব অভিনয় দেখে প্রীত হন এবং তাঁর আদেশে তণ্ডু ভরতকে বিভিন্ন 'করণ' ও 'অঙ্গহার' সমেত 'তাণ্ডব' নৃত্য শিখিয়ে দেন। এইভাবে নাটকের উৎপত্তি। ভরত থেকে নাট্যবেদের প্রয়োগ প্রথমে স্বর্গে, পরে মর্ত্যে প্রচার হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রের এই বর্ণনা কৌতূহলজনক। কিন্তু এই বর্ণনা থেকে সংস্কৃত নাটকের জন্মের স্থান ও কাল সম্পর্কে কোনো ধারণাই করা যায় না। এই অনুমান একেবারেই অসঙ্গত নয় যে, নাট্যশাস্ত্র রচনাকালে রচনাকারের মনে জন্ম-ইতিহাসের কোনো স্পষ্ট স্মৃতিই ছিল না এবং এই স্পষ্ট স্মৃতির অভাব প্রমাণ করে যে, সংস্কৃত নাটকের জন্ম-ইতিহাস খুবই প্রাচীন।

নাট্যশাস্ত্র সম্প্রদায়-বাহিত শাস্ত্র। কোনো ব্যক্তি বা কোনো সম্প্রদায়—যিনি বা যাঁরাই নাট্যশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে থাকুন না কেন, জন্ম-ইতিহাসের যে অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করেছেন, তার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। যে কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রারম্ভেই এই একই ধরনের কাহিনী মিলবে। এই কাহিনীর প্রকৃতিও খাঁটি ভারতীয়, নাট্য-শাস্ত্রকে উপবেদ ঘোষণা করে কৌলীন্য বাড়াবার চেষ্টা মাত্র। নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল সম্ভবত দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নয়। এই কাহিনীও তার চেয়ে খুব বেশী প্রাচীন বলে মনে করবার হেতু নেই।

সংস্কৃত নাটকের জন্ম-ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্বভাবতই বৈদিক সাহিত্যের কথা মনে পড়বে। ঋগ্বেদে এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যাদের মধ্যে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য অনুমান করা অসঙ্গত নয়। 'যম ও যমী' (১০।১০), 'ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপি' (১০।৮৬), 'পুরুরবা ও উর্বশী' (১০।৯৫), 'সরমা ও পণি' (১০।১০৮) প্রভৃতি সূক্তগুলি স্পষ্টতই কথোপকথনের নাটকীয় ভঙ্গিতে রচিত। কিন্তু এ ধরনের সূক্তগুলির প্রকৃতি ঠিক কী ছিল এবং এগুলির সাহায্যে ঠিক কী ধরনের অনুষ্ঠান হতো আজ তা যথাযথ বলা কঠিন।

ম্যাক্সমুলারই সর্বপ্রথম ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যে নাটকীয় উপাদানের সন্ধান করেছিলেন। প্রথম মণ্ডলের ১৬৫ সংখ্যক সূক্ত সম্পর্কে তাঁর অনুমান এই যে, মরুৎগণের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্ভবত দুই পক্ষে ভাগ হয়ে এটি অভিনীত হতো। একদল হতো ইন্দ্র, অপর দল হত মরুৎগণ ও তাঁদের অনুচর। ম্যাক্সমুলার বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে নাটকের জন্মের যোগসূত্র কল্পনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে সিলভ্যাঁ লেভি তাঁকে সমর্থন করেন। লেভির মতে নৃত্য ও গীত-শিল্প বৈদিক যুগেই পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল।

ঋগ্বেদের উষাসূক্তে (১।৯৫) উষাকে উন্মুক্তবক্ষ-নর্তকীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সোম প্রস্তুতকালে মেয়েদের গান করা যে আবশ্যিক কর্ম ছিল ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে। পরবর্তী কৃষ্ণযজুর্বেদে 'মার্জালীয় অগ্নির' চারধারে জলের পাত্র মাথায় নিয়ে নৃত্য ও গীতের বর্ণনা আছে। বৈদিক যুগের কুমারীদের বিবাহের বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে নৃত্য ও গীতের পারদর্শিতা অন্যতম ছিল। অথর্ব-বেদেও নৃত্য ও গীতে সময় কাটানোর উল্লেখ আছে।

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে (২৯ ৫) স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনো কোনো বৈদিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত ও বাদ্য আবশ্যিক কৃত্য ছিল। বৈদিক অনুষ্ঠানে উদ্‌গাতার বিশিষ্ট স্থান ছিল। অশ্বমেধ ও পুরুষমেধ যজ্ঞে বীণা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগের উল্লেখ পাই, 'মহাব্রত'

অনুষ্ঠানে নৃত্য ও গীতের প্রাচুর্য ছিল বেশি। যজ্ঞবেদীর চারধারে যুবতীরা নৃত্য করতো, তাদের নৃত্য শেষ হওয়ার আগে বিবাহিতাদেরও যোগ দিতে হতো।

এ ধরনের নৃত্যগীতময় অনুষ্ঠান ও ঋগ্বেদের সংলাপময় সূক্তগুলি নাটক নয়, নাটকের বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র। সংলাপ-সূক্তগুলি ও বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির আনুমানিক প্রকৃতির মধ্যে পরিপূর্ণ নাটক খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

কিন্তু 'মহাব্রত' অনুষ্ঠানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সত্যিই কৌতূহল-জনক। এই অনুষ্ঠানে সোমযজ্ঞের জন্য সোমক্রয়ের একটি ব্যাপার ছিল। অনুষ্ঠানের শেষের দিনে জনৈক সোমবিক্রেতাকে দাঁড় করিয়ে তার মূল্য পরিশোধ না করে প্রহার দিয়ে বিদায় করা হতো। অনেকটা মধ্যযুগের ইউরোপীয় 'মিস্ট্রি প্লে'র শয়তান নিগ্রহের মতো। আর একটি আবশ্যিক ব্যাপার ছিল, গোলাকার একখণ্ড সাদা চামড়ার অধিকার নিয়ে জনৈক শূদ্র ও বৈশ্যের প্রতিযোগিতা। শূদ্রের রং হত কালো, বৈশ্যের সাদা। শূদ্রকে পরাজয় বরণ করতে হতো।

শীতাগমে সূর্যের ক্ষীয়মাণ শক্তিবৃদ্ধির জন্য অনুকৃতিমূলক আদিম অনুষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করলে মোটেই অন্যায় হয় না। সাদা রঙের চামড়ার খণ্ডটি আলোর উৎস সূর্যের প্রতিরূপ, আর অন্ধকারের প্রতীক হিসাবে শূদ্র, আর্য-বৈশ্যের প্রতিপক্ষ। এই রকম অনুষ্ঠানের নজীর বিভিন্ন দেশেই মিলবে এবং নাটকের জন্মের সঙ্গেও এই রকম অনুষ্ঠানের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'মহাব্রত' অনুষ্ঠান সম্ভবত দক্ষিণায়নে সূর্যের শক্তিবৃদ্ধির অনুষ্ঠান,[1] যাতে সূর্য আবার পূর্ণ শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, ধরিত্রী আবার শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে।

এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আরও একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার ছিল, এক বটু আর গণিকার কলহ। এই কলহের ভাষা অশ্লীল এবং

সম্ভবত প্রাচীনকালে এই কলহের পর যৌনক্রিয়াও আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। নাটকসৃষ্টির দিক থেকে এই ব্যাপারটির মূল্য অপরিসীম। নাটকসৃষ্টির সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির অনুষ্ঠানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শূদ্র-বৈশ্যের প্রতিযোগিতা এবং বটু-গণিকার ব্যাপার দুটিকে যুক্তভাবে দেখলে অনুষ্ঠানের যে অনুকৃতিমূলক রূপ ধরা পড়ে, তার মধ্যে নাটক সৃষ্টির যথেষ্ট উপাদান আছে। কিন্তু যাকে নাটক বলি, তা এর মধ্যে নেই, আছে বড় জোর নাটকের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নাটক অথবা প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ নেই। যজুর্বেদে সকল প্রকার সম্ভাব্য বৃত্তিজীবীর উল্লেখ আছে, কিন্তু অভিনেতার কোনো উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, পরবর্তী কালের বহুল ব্যবহৃত 'নট' শব্দটি একেবারে অনুপস্থিত। 'শৈলূষ' নামে যে শব্দটি আছে, তা 'নটে'র সমার্থক বলে মনে হয় না।[১]

মহাভারতে 'নটে'র উল্লেখ আছে, কিন্তু স্পষ্টভাবে নাটকের উল্লেখ কোথাও নেই। রামায়ণে 'নট', 'নাটক' ও 'সমাজের' উল্লেখ পাই; রামায়ণের 'ব্যামিশ্রক' শব্দটি টীকাকারের মতে মিশ্র ভাষায় রচিত নাটক। নাটক ও নাটক-অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাই হরিবংশে। কিন্তু পৌরাণিক উল্লেখ ও বর্ণনা থেকে নাটকের সময় নির্ধারণ করা যায় না। মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখের প্রামাণিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ও মতভেদ আছে। আর হরিবংশ রচনাকালের (৩য় খ্রীষ্টাব্দ) আগেই যে ভারতীয় নাটক পূর্ণ-বিকশিত রূপ লাভ করেছিল সে সম্পর্কেও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

'সূত্র'-সাহিত্যেও নাটকের উল্লেখ নেই। পাণিনি নাটকের উল্লেখ না করলেও 'নটসূত্রের' উল্লেখ করেছেন। 'নটসূত্র' নটদের জন্য রচিত শাস্ত্র। পাণিনি অনুসারে 'নটসূত্রে'র রচয়িতা শিলালী ও

কৃশাশ্ব, এইজন্য তাদের সম্প্রদায় বোঝাতে 'শৈলালী' ও 'কৃশাশ্বী' শব্দের প্রয়োগ। পাণিনির ব্যাকরণেই সর্বপ্রথম 'নট' শব্দের সাক্ষাৎ মেলে। এই 'নট' শব্দে নাটকের অভিনেতা বোঝায় না একথা যাঁরা বলতে চান, তাঁদের সপক্ষে খুব জোরালো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। 'নট' শব্দটি সংস্কৃত নয়, অথচ অভিনেতা অর্থ বোঝাতে শব্দটি পরবর্তী কালে বহুল প্রচলিত। সংস্কৃতে 'নৃত্‌' ধাতু 'নট্' ধাতুর সমার্থক। কিন্তু 'নৃত্‌' সংস্কৃতে নৃত্য করা বা নাচ করা বা নাচা। অভিনয় করা বোঝানোর মতো স্পষ্ট কোনো ধাতু সংস্কৃতে নেই, প্রাকৃত-মূল 'নট্‌' ধাতুই একমাত্র সেই অর্থে প্রয়োজ্য।[২] একথা সত্য যে, পাণিনির যুগে নাট্য ও নৃত্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল কিনা তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু প্রভেদ ছিল না, একথা বলারও কোনো হেতু নেই। নর্তক বা Pantomimist বোঝাতে যে শব্দ আগে কখনো প্রযুক্ত হয়ই নি সে 'নট' শব্দ এবং নটদের জন্য 'সূত্র' বা শাস্ত্র কী ভাবে নর্তক তাদের শাস্ত্র হতে পারে? বরং একথা মনে করবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, পাণিনির আগেই অ-সংস্কৃত 'নট' শব্দ 'অভিনেতা' অর্থে সংস্কৃতে স্থান পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, পাণিনির আগেই শিলালী ও কৃশাশ্ব 'নটসূত্র' বা অভিনেতাদের শিক্ষণীয় নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। জটিল ও সাম্প্রদায়িক না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোনো শিল্পসম্পর্কিত শাস্ত্র গড়ে ওঠে না, সুতরাং শিলালী ও কৃশাশ্বের আগেই নাট্যশিল্পের অস্তিত্ব কল্পনা অসঙ্গত নয়। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হলে, পাণিনির অনেক আগেই ভারতীয় নাটকের সৃষ্টি। পাণিনির সময় সর্বনিম্ন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী।

নাটকের অস্তিত্ব প্রমাণ এবং সময় নির্ধারণের জন্য পণ্ডিতেরা পতঞ্জলির মহাভাষ্যের সাক্ষ্যের উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে পাণিনির ৩।১।২৬ সূত্র সম্পর্কে ক্যাত্যায়নের

টীকার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যার বিষয়, অতীতকালের ঘটনা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমানকাল ব্যবহারের বিধি। যেমন, বাসুদেব কংসকে বধ করেছেন (৩।২।১১১)। অপর একটি অনুচ্ছেদে পতঞ্জলি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তিনি (বাসুদেব) কংসকে বধ করাচ্ছেন (ঘাতয়তি), বলিকে বন্ধন করাচ্ছেন (বন্ধয়তি)। এখানে বর্তমানকাল হয় কি করে? কংস তো 'চিরহত', বলি 'চিরবদ্ধ'। বর্তমানকালের প্রয়োগ এই জন্য যে, 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' বর্তমানে সত্য সত্য ঘটছে না, তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে মাত্র। এই বর্ণনা একাধিক প্রকারের হতে পারে। যেমন, প্রথমত, শৌভিকরা / শোভনিকরা যখন প্রত্যক্ষভাবে কংসকে বধ করায় বা বলিকে বন্ধন করায়; দ্বিতীয়ত, যখন কংসের নিগ্রহ চিত্রে অঙ্কিত হয় এবং তৃতীয়ত, গ্রন্থিকরা যখন শব্দগ্রন্থনের মধ্যে দিয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বুদ্ধির বিষয়ভূত করে প্রকাশ করে। অতীতের ঘটনা হলেও, এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই বর্তমানকাল ব্যবহার করা যায়। কারণ, এখানে ঘটনা বর্তমানে সত্য সত্য ঘটছে না, বর্ণনা করা হচ্ছে মাত্র।

এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি স্পষ্টতই নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত। শৌভিকরা / শোভনিকরা কী ভাবে প্রত্যক্ষত 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' বর্ণনা করতো? তারা সংলাপ ব্যবহার করতো কিনা তার উল্লেখ নেই। গ্রন্থিকেরা যে 'শব্দ-গ্রন্থনে'র মাধ্যমে বর্ণনা করতো তার স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং শৌভিকরা/শোভনিকরা শব্দ ব্যতিরেকেই বর্ণনা করতো, এই অনুমান করে নিতে হয় এবং বলতে হয় যে তারা মূকাভিনয়ের মতো দর্শকের সামনে 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' বর্ণনা করতো। কিন্তু শৌভিকদের / শোভনিকদের বর্ণনার পদ্ধতি সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা কঠিন। কৈয়টের মতে শৌভিকরা / শোভনিকরা নটদের অনুকৃতি ব্যাখ্যাকারী উপাধ্যায়। কেউ কেউ বলেন, শৌভিকরা / শোভনিকরা দর্শকদের সামনে ছায়া-নাট্য ব্যাখ্যা করতো। লেভির মতে তারা নটদের শিক্ষাদাতা।

গ্রন্থিকদের ক্ষেত্রে পতঞ্জলি আরও বলেছেন যে, এদের একদল কংসভক্ত হতো, অন্যদল হতো বাসুদেব ভক্ত, অর্থাৎ কংসবধ বর্ণনা প্রসঙ্গে দুই দলে ভাগ হয়ে যেতো।' এদের মধ্যে একদল মুখে লাল রং মাখতো, অন্য দল মাখতো কালো রং। দুই দলে ভাগ হতো কারা? গ্রন্থিকরা না দর্শকরা? কীথ্ জোর দিয়ে বলেন, গ্রন্থিকরাই। তারা 'শব্দ-গ্রন্থনে'র মাধ্যমে বাসুদেব কংসের ঘটনাবলী জীবন্ত করে তুলতো, তারাই একদল বাসুদেবভক্ত ও একদল কংসভক্ত—দুই দলে ভাগ হয়ে যেতো। বাসুদেবভক্তেরা লাল রং আর কংস-ভক্তেরা কালো রং মাখতো। গ্রন্থিকরা দুই দলে ভাগ হয়ে কংস-বাসুদেবের প্রতিদ্বন্দ্বের অনুকৃতি করলে ব্যাপারটি যে নাটকের অনেকখানি কাছাকাছি এসে পড়ে, একথা সত্য। কিন্তু হরদত্ত তাঁর কাশিকাপদমঞ্জরীতে মহাভাষ্যের উক্ত অংশ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন যে, দর্শকরাই দুই দলে ভাগ হয়ে যেতো, লাল ও কালো রং তারাই মাখতো।[৩]

মহাভাষ্যের আলোচ্য অংশ থেকে নাটকের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কিছুই প্রমাণ হয় না। শুধু এইটুকুই বলা যায়, উল্লিখিত শৌভিক ও গ্রন্থিকদের ব্যাপার দুটির মধ্যে নাট্যাভিনয়ের প্রায় সমস্ত উপাদান মিলছে মাত্র এবং এই উপাদানগুলি সুসংবদ্ধ হলে পূর্ণাঙ্গ নাটকসৃষ্টি সম্ভব। কীথ্ এদের মধ্যেই সংস্কৃত নাটকের আদিম রূপ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, শৌভিকদের এই ধরনের মূকাভিনয় এবং দুই দলে ভাগ হয়ে গ্রন্থিকদের 'শব্দ-গ্রন্থন' ব্যাপারের সঙ্গে মহাকাব্য আবৃত্তি যুক্ত হয়ে সংস্কৃত নাটকের জন্ম হয়েছে। এবং তাঁর মতে জন্মকাল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পরে। অর্থাৎ পতঞ্জলির আগে তিনি সংস্কৃত নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে পারেন নি।

সংস্কৃত নাটককে শৌভিক ও গ্রন্থিকদের ব্যাপারের সুসংবদ্ধ রূপ হিসাবে মেনে নিলেও পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি তাদের অস্তিত্ব

কল্পনায় বাধা কোথায় ? প্রাকৃত জীবনের বহুবিধ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বহুবিধ অনুকৃতিমূলক উপাদান নিয়েই বিভিন্ন দেশের নাটকের রূপ সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃত উপাদান একত্রিত, মার্জিত ও সুসংহত হয়ে নাটকের সৃষ্টি বলেই আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে নাটক হয়ে ওঠে অখণ্ড একটি শিল্পরূপ। নাটকসৃষ্টির মূলে যেমন একটা ধারাবাহিকতা আছে, তেমনই আছে সজাগ বিশুদ্ধ শিল্পমনের প্রভাব। কিন্তু নাটকের বিভিন্ন অনুকৃতিমূলক উপাদানগুলি বহুকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। কারণ, প্রাকৃত জীবনের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উপর তাদের ভিত্তি। শিল্পপ্রেরণা সেখানে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে অনুষ্ঠান। শৌভিক ও গ্রন্থিকদের ব্যাপার সংস্কৃত নাটকের উপাদান যোগালেও, স্বাভাবিক কারণেই তারা স্বচ্ছন্দে নাটকের পাশাপাশি অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

বুদ্ধের সমকালে নাটকের অস্তিত্ব ছিল কিনা তা জোর দিয়ে বলা কঠিন। বৌদ্ধ 'সুত্ত'-গুলির সময় নিয়ে মতভেদ আছে। বৌদ্ধ 'সিক্‌খা' পদগুলিতে 'নচ্চ-গীত-বাদিত্ত' ও 'পেক্‌খা' দর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদের মধ্যে 'পেক্‌খা' বা প্রেক্ষা শব্দটি সম্ভবত নাট্যাভিনয় অর্থেই প্রযুক্ত। এই 'প্রেক্ষা' বা নাট্যাভিনয় প্রাচীন 'সমাজে'র একটি অঙ্গ ছিল। 'সমাজ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছিল 'একসঙ্গে জড় হওয়া', তার থেকে বিশিষ্ট অর্থ দাঁড়িয়েছিল 'মেলা,' যেখানে হয় বহু-জনের সমাগম, মল্লক্রীড়া, ধনুর্বিদ্যা ও রণকৌশল প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে কখনো কখনো খানা-পিনা নাচ-গানের হুল্লোড়। অশোকের সময়ে 'সমাজ' অনুষ্ঠানে শেষোক্ত ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবহুলতা ঘটে-ছিল, তাই তিনি সাধারণভাবে হুকুম দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যমধ্যে 'সমাজ' অনুষ্ঠান চলবে না (ন চ সমাজো কতব্যো)। তবে যে 'সমাজ' অনুষ্ঠানে অনাচার ব্যভিচার ছিল না তাতে তার নিষেধ ছিল না।"[৪] অশোক 'সমাজ'কে ধর্মানুষ্ঠান বলেই জানতেন।

বাৎসায়ন তাঁর 'কামসূত্রে' 'সমাজে'র উল্লেখ করেছেন। এ 'সমাজ' দেব-মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত এবং 'সমাজে'র আবশ্যিক অঙ্গ ছিল 'প্রেক্ষণক'। নাগরকবৃত্তে ঘটানিবন্ধন ব্যাখ্যায় বাৎসায়ন বলেছেন: "পক্ষে বা মাসে সরস্বতীর ভবনে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের 'সমাজ' অবশ্য কর্তব্য। আগন্তুক কুশীলবেরা (এই 'সমাজে') তাঁদের সামনে 'প্রেক্ষণক' প্রদর্শন করবে। দ্বিতীয় দিনে তাঁদের কাছ থেকে (কুশীলবেরা) পূজালাভ করবে। ভালো লাগলে, আবার তাঁরা দর্শন করবেন, নতুবা তাদের বিদায় দেবেন।" এই 'প্রেক্ষণক' স্পষ্টত নাট্যাভিনয়, নাটকাভিনয় যদি নাও বলা যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'প্রেক্ষা' শব্দটি উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন জাতক-কাহিনীতে 'সমাজে'র যে উল্লেখ আছে তা থেকেও জানা যায়, নাট্যাভিনয় 'সমাজে'র গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং প্রধান আকর্ষণ ছিল। দামোদরগুপ্ত তাঁর কুট্টনীমতে বারাণসীর বৃষভধ্বজের মন্দিরের 'সমাজে' এক ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায়ের 'রত্নাবলী' অভিনয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

ভিক্ষুদের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বুদ্ধের স্পষ্ট নিষেধ থাকলেও পরবর্তী কালে বৌদ্ধরা সে নিষেধের মর্যাদা রাখতে পারেন নি। পরবর্তী কালের বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে নাটকের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ললিত-বিস্তরে তো বুদ্ধকে নাট্যশাস্ত্রে পণ্ডিত বলেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধকাহিনী অনুসারে বুদ্ধের সমসাময়িক বিম্বিসার নাগরাজের সম্মানার্থে নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। আরও পরবর্তী কালের গ্রন্থ 'অবদান-শতকে'র একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে, ক্রকুচ্ছন্দ নামে অতীতের এক বুদ্ধ শোভাবতী নগরীতে একদল নটের সাহায্যে নাটক অভিনয় করেছিলেন। সূত্রধার নিজে বুদ্ধের ভূমিকা নিয়েছিলেন, অন্যান্য সকলে নিয়েছিলেন ভিক্ষুদের ভূমিকাগুলি। এই একই দল পরবর্তী কালে রাজগৃহে গৌতমবুদ্ধের সামনে আবার অভিনয় করেছিলেন। দলের মধ্যে কুবলয়া নামে

এক যশস্বিনী নটী ছিল। হাবে ভাবে সে অনেক ভিক্ষুর মতি-বিকারের কারণ ঘটিয়েছিল, তাই বুদ্ধ তাকে বিরূপা করে দেন। সে পরে বুদ্ধের শিষ্যা হয়। 'দিব্যাবদান-শতকে'ও নাটকের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধপণ্ডিত ও কবি অশ্বঘোষের 'শারীপুত্রপ্রকরণ' এতাবৎ আবিষ্কৃত সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন। নাটকের কেন্দ্র-চরিত্র বুদ্ধের পার্শ্বচর শারীপুত্র। নাটকে বুদ্ধ উপস্থিত।

বুদ্ধের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটকাভিনয়ের জনপ্রিয়তা ও অনুশীলন থেকে এই অনুমানই সঙ্গত যে, নাট্যাভিনয় জনজীবনে এমনই প্রভাবশীল ছিল যে সেই জীবনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে গিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে নাট্যাভিনয়ের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এই কারণেই বুদ্ধকে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণ করতে গিয়ে নাট্যশাস্ত্র বিশারদ করে তুলতেও হয়েছিল এবং বুদ্ধের জীবনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক নাটক-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল।

ইউরোপের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও নাট্যাভিনয়ের সম্পর্কের সঙ্গে এই ব্যাপারের তুলনা করা যেতে পারে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ক্লাসিকাল নাটকের মৃত্যু ঘটতে যেটুকু বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হয়েছিল গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলির প্রত্যক্ষ বিরোধিতায়। তাঁরা লোকের মন থেকে নাটকের স্মৃতি পর্যন্ত মুছে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী কালে নতুন নতুন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্মের ক্রমপ্রসারের ফলে বিভিন্ন দেশের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় প্রকৃত জীবনযাত্রার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নাট্যমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে ধীরে ধীরে আংশিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ধরনের নাট্যমূলক অনুষ্ঠানগুলির প্রভাব প্রাকৃত জীবনে এত বেশি ছিল যে তার প্রতিরোধে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলিকে স্বর্গ-নরক, আদম-ইভের পতন, শয়তানের নিগ্রহ এবং আরও পরে খ্রীষ্ট ও সন্তদের জীবন প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত কাহিনীগুলিকে গির্জার পবিত্র বেদীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা

করতে হয়েছিল। এইভাবেই মধ্যযুগের ইউরোপের ‘মিস্ট্রি’ ও ‘মিরাক্‌ল’ প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের উদ্ভব। কিন্তু বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি ব্যাপার ঘটেছিল। খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মতো ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের কোনদিন নিরঙ্কুশ আধিপত্য ঘটে নি, আর ‘পেক্‌খা’ বা নাট্যাভিনয়ের স্মৃতি জন-মন থেকে কখনো মুছে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বরং বৌদ্ধদের পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নাট্যাভিনয় ক্রমশ সুষ্ঠু শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে আনন্দনিষ্যন্দী হয়ে উঠেছিল। একে পিউরিটানিক দৃষ্টিতে দেখা পরবর্তী বৌদ্ধদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, বুদ্ধ যাই বলে থাকুন না কেন। তাই আনন্দের জন্য না হলেও, বুদ্ধ-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তাঁরা এই ঐতিহ্যময় শিল্পরূপটি গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ থেকে অশ্বঘোষ পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান তা পূর্ণাঙ্গ নাটকসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই যার জোরে বলা চলতে পারে, এই সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটক সৃষ্টি হয়েছে, এর আগে হয় নি।

উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সংস্কৃত নাটকের জন্মকাল যথাযথ ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে কোনো দেশেরই নাটকসৃষ্টির পিছনে একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের জন্ম-ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নানা কারণে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যে সমস্ত উপাদান মিলেছে তা প্রচুর হতে পারে, কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। নাটক অথবা নাট্যশিল্প দুরূহতম শিল্প। শিল্পের সমস্ত শাখাগুলিকে আত্মসাৎ করে এর পরিপুষ্টি। নাটক সৃষ্টিই মানুষের বহু দীর্ঘকালের ‘নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা’র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। রূপহীন (formless) অনিয়ন্ত্রিত আকার ছেড়ে ক্রমশ সুস্থির শিল্পরূপে প্রকাশিত হওয়াই নাটকের বিবর্তনের ইতিহাস। এই বিবর্তনের পথেই স্থূল ও সরল রূপ (form) ছেড়ে

নাটক হয়েছে ক্রমশ মার্জিত ও জটিল। আর এই পথেই ধর্মানুষ্ঠানের আবশ্যক কৃত্য থেকে নাটক হয়ে উঠেছে ধর্ম-নিরপেক্ষ রমণীয় শিল্প। নাট্যশাস্ত্রে যে বিভিন্ন প্রকার নাটকের লক্ষণ ও প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়েছে তা বহুকালের পরীক্ষালব্ধ ঐতিহ্য। এগুলির লক্ষণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে পূর্ণাঙ্গ নাটকসৃষ্টির একটা ধারাবাহিকতা হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সেই সূত্রে তার প্রাচীনত্বের খানিকটা অনুমান করা যাবে।

নাট্যশাস্ত্রকার নাটক বা রূপককে লক্ষণ অনুসারে দশ ভাগে ভাগ করেছেন—'নাটক', 'প্রকরণ', 'অঙ্ক,' 'ব্যায়োগ', 'ভাণ', 'সমবকার', 'বীথী', 'প্রহসন', 'ডিম' ও 'ইহামৃগ'। এই দশ প্রকার রূপককে প্রকৃতি অনুসারে স্বচ্ছন্দে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে পড়ে 'ভাণ'। এটি এক অঙ্কের একোক্তিমূলক নাটক। 'বীথী' দ্বিতীয় পর্যায়ের। এখানে চরিত্র একটি অথবা দুটি, অঙ্ক একটি। 'ব্যায়োগ', 'প্রহসন' ও 'অঙ্ক' তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। এখানেও অঙ্ক একটি, চরিত্রসংখ্যা একাধিক। চতুর্থ পর্যায়ে 'সমবকার' 'ডিম' ও 'ইহামৃগ'। 'সমবকারে'র অঙ্ক সংখ্যা তিন, 'ডিম' ও 'ইহামৃগের, চার, তিনটিতেই চরিত্রের সংখ্যা বেশি, অঙ্কবন্ধন শিথিল। পঞ্চম পর্যায়ে পড়ে 'নাটক' ও 'প্রকরণ'। এদের অঙ্ক সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ। দশ-রূপকের মধ্যে 'নাটক' ও 'প্রকরণ'ই শ্রেষ্ঠ এবং চূড়ান্ত।

পারস্পরিক পার্থক্য সত্ত্বেও পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত নাটকগুলির মধ্যে বিবর্তনের যোগসূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। নাটকের প্রথম পদক্ষেপে একটি নটই স্বাভাবিক। অঙ্কবিভাগ অনেক পরের ব্যাপার। একোক্তিমূলক নাটক বা 'ভাণ'কে স্বচ্ছন্দে আদিম অনুকৃতিমূলক নাট্য-ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বীথী'র সঙ্গে 'ভাণে'র খুব বেশি পার্থক্য নেই। ক্ষেত্রবিশেষে চরিত্রের সংখ্যা দুটি মাত্র। তৃতীয় পর্যায়ের 'ব্যায়োগ', 'প্রহসন' ও 'অঙ্কে'র পক্ষেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এখানে শুধু চরিত্রসংখ্যা

একাধিক, পার্থক্য বিষয়বস্তুর। তিনটি পর্যায়ের মধ্যেই 'মহাব্রত' অনুষ্ঠানের পরিচিত সোমবিক্রেতার নিগ্রহ, বৈশ্য-শূদ্রের প্রতিদ্বন্দ্ব এবং বটু ও গণিকার কলহের বিষয়বস্তু স্বচ্ছন্দে স্থান পেতে পারে। বলা যেতে পারে, এ পর্যন্ত নাটকের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বেড়েছে এবং নটের সংখ্যা এক থেকে অনেকে পৌছেছে। বৈচিত্র্যের চেয়েও নটের সংখ্যাবৃদ্ধি নাটকের রূপ-বিবর্তনের পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব-পূর্ণ। নটের সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে কাহিনীর নাট্যগুণ (নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও গতি) উদ্‌ঘাটন করা কষ্টকর।

খাঁটি নাটক-সৃষ্টির জন্য নটের সংখ্যাবৃদ্ধি আদিম রঙ্গমঞ্চে মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ নাটকের জন্ম ধর্মানুষ্ঠান থেকে এবং ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত মানুষের রক্ষণশীলতা দীর্ঘস্থায়ী। কোনো শিল্পবোধের খাতিরেই মানুষ সহজে সেই রক্ষণশীলতা বিসর্জন দিতে চায় না। তাই নাটকে নটের সংখ্যাবৃদ্ধি সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। নটের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নাটকে সহজেই ঘাত-প্রতিঘাতময় কাহিনীর স্থান দেওয়া চলে, আর কাহিনী ঘাত-প্রতিঘাতময় হলে উপযুক্ত নাট্যরস সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন 'সন্ধি' অনুসারে অঙ্কবিভাগ অনিবার্য। এইভাবেই চূড়ান্ত শিল্পরূপ হিসাবে নাটকের সৃষ্টি। সন্ধি অনুসারে নাটকের অঙ্কবিভাগ আরও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। এই পর্যায়ে পৌঁছুতে নাটককে ধর্মানুষ্ঠানের আবশ্যিক কৃত্য থেকে অনেকখানি দূরে সরে আসতে হয়, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকেও নাটক হয়ে ওঠে আনন্দদানের বিশিষ্ট শিল্পরূপ। আর তখন থেকেই দেবকাহিনীর বহির্ভূত লৌকিক কাহিনী নাটকের বিষয়ভুক্ত হতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের বিবর্তনের এই সূত্রটি মনে রাখলে চতুর্থ পর্যায়ের সমবকার 'ইহামৃগ' ও 'ডিম'কে অঙ্কবিভক্ত পূর্ণাঙ্গ 'নাটক' ও 'প্রকরণে'র পূর্ববর্তী স্থূলরূপ হিসাবে চিনতে ভুল হয় না। 'সমবকারে'র অঙ্কবন্ধন শিথিল, নামের ব্যুৎপত্তিই তার প্রমাণ। বিভিন্ন অঙ্কের কালপরিমাণে আশ্চর্য রকমের পার্থক্য। 'সমবকার' স্পষ্টতই অঙ্কবিভক্ত নাটকের

আদিম রূপ। 'ইহামৃগ' ও 'ডিম' এর পরবর্তী স্তর। এদেরই সুষ্ঠু পরিণতি পঞ্চম পর্যায়ের 'নাটক' ও 'প্রকরণ'। এই 'নাটক' ও 'প্রকরণে'ই সংস্কৃত নাটকের যা কিছু গৌরব।

অশ্বঘোষের নাটকখানি শাস্ত্রসম্মত সর্বলক্ষণযুক্ত 'প্রকরণ'। 'সমবকার','ইহামৃগ' ও 'ডিমে'র পৌরাণিক উল্লেখ ছাড়া কোনো প্রাচীন নিদর্শন এ পর্যন্ত মেলে নি এবং না মেলাই স্বাভাবিক। নাটকের পূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টির ফলে স্থূল রূপগুলির অবলুপ্তিই স্বাভাবিক। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি প্রাচীন রূপ বর্তমান থাকা একেবারে অসম্ভব ঘটনা নয়। সম্ভবত বিষয়বস্তুর বিশিষ্টতার জন্য 'সমবকার' প্রভৃতি বেশ কিছুকাল বর্তমানও ছিল। কিন্তু শিল্পরূপ হিসাবে পরবর্তী কালে স্বাভাবিকভাবেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রকার সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে প্রাচীন 'সমবকার' প্রভৃতিকে ঐতিহ্য হিসাবেই নাটকের রূপভেদ বলে মেনে নিয়েছেন। অশ্বঘোষের সময় সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। 'নাটক' ও 'প্রকরণে'র পূর্ণরূপ যে তার আগেই সুস্থির হয়ে গিয়েছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। আর, এই সুস্থির রূপ গ্রহণ করতে যে কত দীর্ঘ সময় লেগেছে তা সহজেই অনুমেয়। গ্রীক নাটকের ক্রমবিবর্তনের কালপরিমাণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীভূত নগর সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাব ও দ্রুত পরিবর্তিত সমাজজীবনের আলোড়ন সত্ত্বেও গ্রীক নাটকের বিবর্তনের কালপরিমাণ যথেষ্ট দীর্ঘ। সেই তুলনায়, ভারতবর্ষের প্রায় অপরিবর্তিত সমাজজীবনে নাটকের বিবর্তনের কালপরিমাণ যে আরও সুদীর্ঘ হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই কাল-পরিমাণ নির্দিষ্ট করার কোনো উপায় অবশ্য নেই, কিন্তু সবকিছু বিচার ও বিবেচনা করে পতঞ্জলির বহুপূর্বেই পূর্ণাঙ্গ নাটকের অস্তিত্ব কল্পনাতেও কোনো বাধা নেই।

টীকা

১. এ সম্পর্কে বেশির ভাগ লেখাই বিদেশী ভাষায়। স্টেন কোনো, হিল্লেব্রান্ড, আলব্রেশ্‌ট হেবের, হাইনরিশ লুডেরস প্রভৃতির লেখা জার্মান ভাষায়। সিলভ্যাঁ লেভির অতি বিখ্যাত 'ল্য তেয়াত্র এঁ্যাদিয়ঁা' বইটির আজও ইংরাজি অনুবাদ হয় নি, কোনো ভারতীয় ভাষায় তো দূরের কথা। অতিশয় মূল্যবান আলোচনা আছে বেরিডেল কিথের 'দি স্যানস্‌ক্রিট ড্রামা' বইয়ের প্রথম খণ্ডে। বাংলায় অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন অমূলচরণ বিদ্যাভূষণ ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে। এটির ইংরাজি অনুবাদ 'দি অরিজিন অব ইণ্ডিয়ান ড্রামা' নামে সংযোজিত হয়েছে সুশীল গুপ্ত লিঃ প্রকাশিত 'দি থিয়েটার অব দি হিন্দুজ' বইতে।

২. 'নট' শব্দের ব্যুৎপত্তি নতুন করে বিচার করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'নট নাট্য নাটক' বইতে। তিনি লিখছেন: "প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছেন যে তৎসম 'নৃত্য, নট, নাট্য' এবং তদ্ভব 'নাচ, নাট, নাটুয়া (নেটে, লেটো) 'একই 'নৃৎ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। এ ধারণা এখন ভুল বলে মনে হচ্ছে। 'নৃত্য, নাচ' নৃৎ ধাতু থেকে উৎপন্ন বটে কিন্তু 'নট, নাট্য, নাটক, নাট, নাটুয়া' সাক্ষাৎভাবে যে নট্ ধাতু থেকে এসেছে সে ধাতুটি নৃৎ ধাতুর বিকারজাত বলে মনে করা দায়। সংস্কৃত 'নট, নাট্য, নাটক' যে নট্ ধাতু থেকে এসেছে তার অর্থ আসলে ছিল নড়াচড়া করা, স্পষ্ট অঙ্গচালনা করা। এই নট্ ধাতুটি নৃৎ ধাতুর অর্থ খানিকটা প্রকাশ করে তাণ্ডব নাচে। কিন্তু কথ্য সংস্কৃতে যে ধাতুটি স্বকীয় বিশিষ্ট অর্থে সচল ছিল তার প্রমাণ হল বাংলার মতো আধুনিক ভাষার 'নড়্' ধাতুর অস্তিত্ব।"—পৃঃ ২।

৩. মহাভাষ্যের আলোচ্য অংশটির বাংলা অনুবাদ: "এই যে যাদের শোভনিক বলা হয়, এরা প্রত্যক্ষ কংসকে হত্যা করছে, প্রত্যক্ষ বলিকে বন্ধন করছে। চিত্রে (অর্থাৎ পুতুলবাজিতে) কেমন? চিত্রেও দেখা যায় ওঠা, নামা, মারামারি, কংসকে নিয়ে হৈচড়াহেচড়ি। গ্রন্থিকদের (অর্থাৎ গ্রন্থপাঠকদের, কথকদের) বেলায় কেমন? সেখানে শুধু কথার ছটায় পাওয়া যায় (অর্থাৎ উপলব্ধ হয়)? সে ব্যাপারেও দেখা যায় যে তাদের (অর্থাৎ নায়কের) জন্ম থেকে বিনাশ পর্যন্ত ঋদ্ধি ব্যাখ্যা করতে করতে

বুদ্ধি বিষয় (অর্থাৎ যা মনে মনে ধারণা করে নিতে হয় সে সব আইডিয়া) প্রকাশ করছে। এ ছাড়াও বিমিশ্র ব্যাপার দেখা যায় ("ব্যামিশ্রা হি দৃশ্যন্তে")। (কোথাও) দেখা যায় কেউ বা কংসের দলের, দেখা যায় কেউ বা বাসুদেবের দলের। এরা রকম রকম রঙ মাখে। কেউ কেউ লালমুখো কেউ কালোমুখো।"—'নট নাট্য নাটক', পৃঃ ১৫। ডঃ সুকুমার সেনের মতে চিত্র হচ্ছে পুতুলবাজি (Puppet-show)। পাদটীকায় তিনি বলেছেন : "চিত্র এখানে আঁকা ছবি নয়। চিত্র এখানে ইন্দো-ইরানীয় অর্থে—প্রতিমূর্তি, প্রতিরূপ। প্রতিমূর্তি অর্থে ছবি শব্দের ব্যবহার এখানে আছে।" তাঁর মতে 'ছউ' নাচের 'ছউ' শব্দটি শোভনিক=শৌভিক থেকে আগত।

৪. ডঃ সুকুমার সেন লিখিত "মঙ্গলযাত্রা, নাটগীত ও পাঁচালি কীর্তন" প্রবন্ধ (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৯)।

ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহ

ভারতবর্ষের কোনো প্রান্তেই আজ পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের কোনো প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। রামগড় পাহাড়ে আবিষ্কৃত একটি গুহাকে ব্লোখ প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাগৃহের একমাত্র নিদর্শন বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দাবি সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে নি।[১] নিদর্শনের অভাবে একদল বলতে চান যে প্রাচীন কালে বিস্তারিতভাবে নির্মিত স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ হয়ত কোনো সময়েই ছিল না, এখনও যেমন মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছাদওয়ালা দেওয়ালহীন নাটমন্দির চোখে পড়ে, প্রাচীন কালেও সম্ভবত ওই ধরনের নাট-মন্দিরের মতো জায়গায় নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হতো, অথবা সাময়িক ভাবে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করে নেওয়া হতো।

প্রাচীন কালে বহুক্ষেত্রে যে সাময়িকভাবে প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হতো তাতে সন্দেহ নেই। নাট্যসম্প্রদায়গুলি দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতো। তারা যে সর্বত্রই স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের সুযোগ পেতো এমন কথা বলা যায় না। তেমন ক্ষেত্রে তাদের অস্থায়ী ও সাময়িক রঙ্গপীঠ তৈরি করে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? মন্দিরপ্রাঙ্গণেও তাদের কষ্টেসৃষ্টে নাট্য-অভিনয়ের ব্যবস্থা করে নিতে হতো। তবু বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের প্রেক্ষাগৃহ এবং প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের এতো বিস্তারিত বর্ণনা ও উল্লেখ আছে, যা থেকে এই অনুমান খুবই সঙ্গত যে, সেকালে বহু ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পিত সুসজ্জিত স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের অস্তিত্ব ছিল।

সংস্কৃত নাটক কোনো কালেই জনসাধারণের ভোগ্য ছিল না। রাজন্যবর্গ, বিত্তশালী নাগরিক এবং কতকাংশে ধর্মগোষ্ঠী ছিল নাটকের

পোষ্টা ও রসভোক্তা। এককথায় সংস্কৃত নাটক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। বিভিন্ন ধর্মোৎসবে উন্মুক্ত স্থানে অথবা মন্দির-প্রাঙ্গণে নাটকের স্থূল রূপভেদ উপভোগ করা ছাড়া সাধারণ জনের কোনো গত্যন্তর ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যমণি ছিলেন রাজা। সুতরাং রাজপ্রাসাদের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের উপযুক্ত প্রেক্ষা-গৃহ থাকবে এইটিই স্বাভাবিক।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত প্রেক্ষাগারের উল্লেখ আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকেও সংগীত-শালার উল্লেখ আছে। প্রেক্ষাগার ও সংগীতশালায় এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে মালবিকা নৃত্যকৌশল দেখিয়েছে এই ধরনের প্রেক্ষাগার বা সংগীতশালায়। এ যে নিছক নাটমন্দির জাতীয় কোনো কিছু নয়, তার প্রমাণ নেপথ্য ও তিরস্করণীর উল্লেখ। সারদাতনয় তাঁর ভাবপ্রকাশে রাজার প্রাসাদে তিন ধরনের প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ করেছেন। নারদের সংগীত মকরন্দে এক ধরনের এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরে দুই ধরনের প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ মিলবে। বিভিন্ন পুরাণের উল্লেখ বাদ দিলেও প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি এবং বিস্তারিত বর্ণনা মিলবে ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে। নাট্যশাস্ত্রের সমগ্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদই প্রেক্ষাগৃহ সংক্রান্ত।

নাট্যশাস্ত্র মতে প্রেক্ষাগৃহ তিন ধরনের : বিক্রুষ্ট, চতুরস্র, এবং ত্রস্র অর্থাৎ আয়ত, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ। মাপ অনুসারে এই তিন ধরনের প্রেক্ষাগৃহই বড়, মাঝারি ও ছোট হতে পারে। বড় প্রেক্ষা-গৃহের মাপ ১০৮ হাত বা ৫৪ গজ, মাঝারির ৬৪ হাত বা ৩২ গজ, ছোটর ৩২ হাত বা ১৬ গজ। ভরত বলেন, বড় প্রেক্ষাগৃহ দেবতাদের জন্য, রাজাদের জন্য মাঝারি এবং ছোট সর্বসাধারণের জন্য। প্রেক্ষাগৃহ বড় হলে নাটকের ভাব যথাযথভাবে ব্যক্ত করা কঠিন হতে পারে, কোনো কিছুর পাঠ বা উচ্চারণ দর্শকের কানে অস্পষ্ট শোনাতে পারে। তাছাড়া, দর্শকরা দূর থেকে স্পষ্ট করে নট-নটীর মুখ দেখতে

পাবে না। মুখ দেখতে না পেলে বিভিন্ন রস ও ভাবের অভিব্যক্তি বুঝবে কি করে? যাতে পাঠ্য ও গেয় সহজে শুনতে পারা যায় তার জন্য মাঝারি প্রেক্ষাগৃহই শ্রেয়। একেবারে ছোট প্রেক্ষাগৃহ হলেও অসুবিধে, কারণ, গত-আগত-প্রচর নৃত্যাদি সেখানে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই ভরতের মতে ৬৪ হাত লম্বা এবং ৩২ হাত চওড়া আয়ত প্রেক্ষাগৃহই নাট্যাভিনয়ের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। নাট্যশাস্ত্রে এই মাঝারি মাপের আয়ত, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহের বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৪ হাত লম্বা ৩২ হাত চওড়া আয়তক্ষেত্রকে সমানভাবে ভাগ করে নিলে ৩২ হাত × ৩২ হাত দুইটি চতুষ্কোণ হবে। তার সামনের অংশটুকু হবে দর্শকদের জন্য রঙ্গমণ্ডপ। পিছনের অংশ আবার ১৬ হাত × ৩২ হাত মাপে দুভাগে ভাগ করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম অংশটি আবার ৮ হাত × ৩২ হাত মাপে দুভাগে ভাগ হবে এবং দ্বিতীয় অংশের কেন্দ্রস্থলে ৮ হাত একটি চতুষ্কোণ থাকবে রঙ্গশীর্ষের জন্য। সামনের ৮ হাত × ৩২ হাত অংশের দুপাশে ৮ হাত জায়গা ছেড়ে দিলে কেন্দ্রস্থলে যে ৮ হাত × ১৬ হাত থাকবে, সেখানে হবে রঙ্গপীঠ বা মঞ্চ। রঙ্গপীঠের দুপাশে ৮ হাত × ৮ হাত জায়গা থাকবে দুটি বারান্দার জন্য। রঙ্গপীঠের পিছনের ১৬ হাত × ৩২ হাত জায়গায় হবে নেপথ্যগৃহ। নেপথ্য গৃহের দুপাশে মঞ্চের দিকে দুটি দরজা থাকবে। রঙ্গশীর্ষ হবে একটু উঁচু, এখানে নাটক শুরু হবার আগে সাজসজ্জা করে অভিনেতারা পূজা নিবেদন করবে এবং সমবেত হবে। রঙ্গপীঠকে যদি চিৎ-হয়ে-শোওয়া মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে রঙ্গশীর্ষকে তুলনা করা যেতে পারে তার মাথার সঙ্গে।

চতুরস্র বা চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহের রঙ্গপীঠ হবে স্বভাবতই চতুষ্কোণ। আয়তের মতো নেপথ্যগৃহে যাবার দুটি দরজা থাকবে না, থাকবে একটিমাত্র। ত্রিস্র বা ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহের বিশেষত্ব এই যে, এর ত্রিকোণ রঙ্গপীঠের একেবারে পিছনের কোণে থাকবে নেপথ্যগৃহের

দরজা। ভরতের মতে একমাত্র চতুষ্কোণ ও আয়ত প্রেক্ষাগৃহেই চতুরস্রগতি সম্ভব।

রঙ্গমণ্ডলে দর্শকদের প্রবেশের জন্য তিন দিকে থাকবে তিনটি দরজা। বিভিন্ন স্তম্ভ দিয়ে রঙ্গমণ্ডল ভাগ করা থাকবে। সাদা রঙের স্তম্ভ দিয়ে নির্দিষ্ট হবে ব্রাহ্মণদের আসন, লালরঙের স্তম্ভ দিয়ে ক্ষত্রিয়ের, উত্তর-পশ্চিম দিকে হলদে রঙের স্তম্ভ দিয়ে বৈশ্যদের এবং উত্তর-পূর্বে নীল রঙের স্তম্ভ দিয়ে শূদ্রদের। আসনগুলি হবে সোপানাকৃতি।

রঙ্গপীঠ কূর্মপৃষ্ঠ বা মৎস্যপৃষ্ঠ হলে চলবে না। কূর্মপৃষ্ঠ অর্থ মাঝখানে উঁচু আর চারধারে ঢালু, মৎস্যপৃষ্ঠ মাঝখানে লম্বালম্বি উঁচু আর দুধারে ঢালু। রঙ্গপীঠ হবে আয়নার মতো মসৃণ এবং সমতল। ভরত বলেন, নাট্যমণ্ডপ দ্বিভূমি হবে। কিন্তু সম্ভবত দ্বিভূমির অর্থ দোতলা নয়, দ্বি-ভূমি অর্থে রঙ্গপীঠ ও রঙ্গমণ্ডলের পৃথক পৃথক ভূমি বা ভিত্তি বোঝানো হয়েছে বলেই মনে হয়।

এসব ছাড়া, গোটা প্রেক্ষাগৃহ সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত করার বিধানও ভরত দিয়েছেন। দেয়ালে নরনারীর নর্মকেলির সুন্দর সুন্দর চিত্র, কাঠে খোদাই লতাপাতা পশুপাখির মূর্তি থাকবে, কাঠের স্তম্ভগুলিতে থাকবে বিভিন্ন যক্ষীমূর্তি ('শালস্ত্রী')। নাট্যমণ্ডপ বা প্রেক্ষাগৃহ হবে গুহার মতো ('শৈলগুহাকার'[২]), তাতে খুব বড় জানলা থাকবে না, জানলাগুলিও 'যন্ত্রজালগবাক্ষ' হবে, যাতে খুব বেশি হাওয়া না ঢুকতে পারে। প্রেক্ষাগৃহ হবে 'ধীরশব্দভাক্'। হাওয়া ঢুকলে নট-নটীর কণ্ঠস্বর, সংগীত প্রভৃতি স্পষ্ট শোনার বাধা ঘটবে। দেওয়ালগুলি মসৃণ করে চুনের প্রলেপ দিতে হবে।

নেপথ্যগৃহের দুটি দরজায় থাকবে পর্দা। তার আড়ালে নট-নটীরা সাজসজ্জা করবে। নানারকম আওয়াজ এবং দৈববাণী প্রভৃতি এখান থেকেই করা হবে। রঙ্গপীঠের পিছনের দুই দরজার মাঝখানে দেয়াল ঘেঁষে যন্ত্রবাদকেরা বসবে। সম্ভবত নেপথ্যগৃহ থেকেও যন্ত্রবাদ্য করা হতো।[৩]

নেপথ্যগৃহের পর্দার নাম—পটী, অপটী, তিরস্করণী, প্রতিশীরা, যবনিকা (প্রাকৃতে জমনিকা)। কেউ কেউ এই যবনিকা নামের মাধ্যমে সংস্কৃত মঞ্চে গ্রীক প্রভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যবনিকার সঙ্গে 'যবন' শব্দের সম্পর্ক কল্পনা সম্ভবত একেবারেই কষ্টকল্পনা। শব্দটি ছিল সম্ভবত 'যমনিকা', প্রাকৃতে হয়েছিল 'জবনিকা,' পরে আবার ছদ্মসংস্কৃত 'যবনিকা' শব্দে পরিণত হয়েছিল।[৪] সাধারণত পাত্রপাত্রী মঞ্চে ঢুকবার সময় পর্দা সরিয়ে দেওয়া হতো। একাজ করতো দুটি সুন্দরী নটী। দ্রুত মঞ্চে ঢুকতে হলে সম্ভবত খুব জোরে পর্দা সরিয়ে দিতে হতো, এরই নাম অপটীক্ষেপ।[৫] পর্দার রং হতো সাধারণত নাটকের স্থায়ী রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তবে কোনো কোনো মতে সর্বক্ষেত্রেই লাল রং ব্যবহার করা চলতো।

রঙ্গমণ্ডল থেকে গোটা রঙ্গপীঠকে আড়াল করে রাখা হতো একটি বড় পর্দা দিয়ে, আজকের ড্রপ-সীনের মতো। পূর্বরঙ্গের প্রাথমিক গীতবাদ্যের পর এই পর্দা বা যবনিকা উঠতো। এমন উল্লেখও আছে, সামনের যবনিকা হবে খুব পুরু কিন্তু সুন্দর। এর পেছনে থাকবে দুখানি খুব মিহি কুয়াশার মতো পর্দা। নাট্য শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের পুরু যবনিকা সরে যাবে, মিহি পর্দার পিছনে লাস্য নৃত্য হবে।[৬] উইলসন অনুমিত আড়াআড়ি পর্দার সমর্থনে কোনো প্রমাণ মেলে না।

কিন্তু যবনিকা সরিয়ে দেওয়া হতো, না গুটিয়ে নেওয়া হতো? কেউ কেউ অনুমান করেন, গুটিয়ে নেওয়া হতো। এই অনুমানের সমর্থনে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের রাজার উক্তিটি উল্লেখযোগ্য। মালবিকা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবার আগে অধৈর্য রাজা বলছে ঃ

নেপথ্যপরিগতায়াশ্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্যাঃ।
সংহর্তুমধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করণীম্॥

এখানে 'সংহর্তুম্' শব্দপ্রয়োগে একাধিক পর্দার অস্তিত্ব এবং সামনের পর্দা গুটিয়ে নেওয়াই অনুমিত হয়। কারণ, রাজা তিরস্করণী সরিয়ে দেবার কথা বলছেন না, 'সংহার' অর্থাৎ 'সংকোচ' করার কথাই বলেছেন। সম্ভবত প্রয়োজনবোধে যবনিকা গুটিয়ে নেওয়া হতো এবং ফেলা হতো।

পরবর্তী কালে সামনের যবনিকা যে একাধিক বার উঠতো নামতো তা অনুমান অসঙ্গত নয়। এই যবনিকা দিয়ে একটি অঙ্কের সমাপ্তি হতো। রাজশেখর এইজন্যই অঙ্কের বদলে 'যবনিকান্তর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কালিদাসের নাটকে একাধিক ক্ষেত্রে 'প্রবিশতি আসনস্থো রাজা' এই নির্দেশ মেলে। 'আসনস্থো রাজা'র প্রবেশ ব্যাপারটি কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে। এখানে যদি অনুমান করা যায়, যবনিকা তোলার পর মঞ্চে আসনস্থ রাজা দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে সে অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে বলেই মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে, শকুন্তলার ৫ম অঙ্কে এবং মালবিকাগ্নিমিত্রের ২য় অঙ্কে পাত্র-পাত্রী যবনিকা তোলার পর দৃশ্যগোচর হলেই সুষ্ঠু হয়। ভবভূতির নাটক থেকেও এ ধরনের নজির তোলা যেতে পারে।

নাট্যশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নয় ধরনের প্রেক্ষাগৃহ চোখে পড়ে। কিন্তু ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের হিসাবে বিভিন্ন মাপ অনুসারে প্রেক্ষাগৃহ আঠারো ধরনের হতে পারে। অবশ্য ভরত বলেছেন, পূর্বোল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী পণ্ডিত ব্যক্তিরা নানা ধরনের প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করে নিতে পারেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে আয়ত ও চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহের উল্লেখ আছে, ত্রিকোণের কোনো উল্লেখ নেই। চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহ হবে ৩২ হাত লম্বা ৩২ হাত চওড়া। সঙ্গীতমকরন্দে কেবলমাত্র চতুষ্কোণের বর্ণনা আছে, এর মাপ ৯৬ হাত × ৯৬ হাত। এই প্রেক্ষাগৃহে চারটি দরজা থাকবে। রঙ্গমণ্ডলের মাঝখানে ২৪ × ২৪ হাত সুন্দর সুবাসিত উঁচু মঞ্চের মাঝখানে থাকবে রাজার আসন। ভাবপ্রকাশে তিন ধরনের উল্লেখ আছে, কিন্তু আয়তের বদলে আছে

বৃত্ত বা গোলাকার প্রেক্ষাগৃহ। ভাবপ্রকাশের মতে রাজার প্রাসাদে তিন ধরনের প্রেক্ষাগৃহই থাকবে, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে সেগুলি ব্যবহৃত হবে। বৃত্ত প্রেক্ষাগৃহে কেবলমাত্র মিশ্রনৃত্যের প্রকারভেদ চিত্রনৃত্য অনুষ্ঠিত হবে এবং এর দর্শক হবে একমাত্র পুরুষ। চতুষ্কোণে অনুষ্ঠিত হবে সমস্ত প্রকার মিশ্রনৃত্য ও সংগীত। দর্শকদের মধ্যে গণিকারাও থাকতে পারবে। কেবলমাত্র মার্গনৃত্য হবে ত্রিকোণ, সেখানে প্রধানা মহিষীসহ সমস্ত পরিবারবর্গই দর্শক হতে পারবে। নাট্য ও নাট্যশালার সম্পর্কে ভাবপ্রকাশকার সারদাতনয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রারম্ভেই বলেছেন, দিবাকর-রচিত তিরিশ খানি বিভিন্ন নাটকের অভিনয় দর্শনের পর তিনি ভাবপ্রকাশ রচনা করেছেন। এই দিবাকর ছিলেন তাঁর নাট্যবেদের গুরু।

টীকা

১. রামগড় পাহাড়ের সীতাবেঙ্গরা গুহার প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা আছে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বাংলা প্রবন্ধে (নবযুগ, ফাল্গুন, ১৩৩১)। 'দি ডান্স থিয়েটার অ্যাট রামগড়' নামে 'দি থিয়েটার অব হিন্দুজ' বইতে ইংরেজি অনুবাদ সংযোজিত আছে।

২. কীথের মতে রামগড়ের গুহার তথাকথিত প্রেক্ষাগৃহ নাটক অভিনয়ের জন্য না হোক, আবৃত্তি অথবা ওই ধরনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কালিদাসের কুমারসম্ভব, মেঘদূত থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে শৈলগুহা-প্রেক্ষাগৃহের অস্তিত্ব ছিল, যেখানে নাটকের অভিনয় হতো এবং রামগড় গুহার প্রেক্ষাগৃহটি সেই জিনিসই। তাঁরা দুজনেই প্রেক্ষাগৃহের আকৃতি প্রসঙ্গে ভরতের "শৈলগুহাকার" উপমাটির মধ্যে তারই সমর্থন খুঁজেছেন। কিন্তু ডঃ ভি. রাঘবন তাঁর 'থিয়েটার আর্কিটেক্‌চার ইন এন্‌সেন্ট ইণ্ডিয়া প্রবন্ধে' তার বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করেছেন।

৩. ডঃ সুকুমার সেন বলেন: "নাটক অভিনয়ের স্থল, 'রঙ্গ' ছিল

যাত্রার আসরের মতো খোলা। স্টেজ বলে বিশেষ কিছু ছিল না। একধারে বসত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাদকদল। এঁদের উপস্থিতিতেই খোলা আসর রঙ্গভূমিতে পরিণত হত।" নট নাট্য নাটক—পৃঃ ৪৭।

ডঃ সেনের এই বক্তব্য যদি যথার্থ হয় তাহলে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ২য় পরিচ্ছেদটির কী অর্থ দাঁড়ায় ?

৪. ডঃ সুকুমার সেনের মতে "কথাটি আসলে "যমনিকা" (অর্থাৎ··· আড়ালকরা চাদর")।" তিনি এর ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন "যম্" ধাতু থেকে।

৫. 'অপটীক্ষেপ' ব্যাপারটি অবশ্য সংশয়রহিত নয়। কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন যখন বলেন—"সেকালে নাটকের অভিনয়ে গ্রীনরুমের মতো কিছু ছিল না। "নেপথ্য" গ্রীনরুম বা সাজঘর নয়। নটেরা বাইরে থেকে সাজ করে চাদর মুড়ি দিয়ে আসরে প্রবেশ করত। তারপর চাদর ফেলে দিয়ে সে অভিনয় জুড়ত। যদি অন্তরালে বা নেপথ্যে বলবার কিছু থাকত তাহলে চাদর মুড়ি দিয়েই ("অপটিক্ষেপেণ") তা সেরে নিত, তারপর চাদর ফেলে দিত।" (নট নাট্য নাটক, পৃঃ ৪৭)—তখন সংশয় তো ঘোচেই না, বরং বিমূঢ় হয়ে পড়তে হয়। "অপটীক্ষেপ" সম্পর্কে অতি সাম্প্রতিক গবেষণা করেছেন ডঃ সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে বিষ্কম্ভক বা প্রবেশক স্বতন্ত্র দৃশ্য নয়। এর পরে মূল অঙ্কে যদি দৃশ্য একই হয় তাহলে আর বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের পর যবনিকা ফেলা বা পটীক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে নাট্যনির্দেশ "অপটিক্ষেপণ প্রবিশতি" অর্থ পরিষ্কার। প্রাচীন নাটকে (কালিদাসে) এইরকম স্থলেই ওই নাট্যনির্দেশ পাওয়া যায়। অঙ্কের মধ্যেও ওই নির্দেশ আছে কয়েকটি জায়গায়। সে সব ক্ষেত্রে পটীক্ষেপ না করেই দৃশ্যান্তরের সূচনা বুঝতে হবে। কালক্রমে এই প্রাচীন ব্যবস্থাটি একটু গোলমেলে হয়ে যায়। পরবর্তী যুগে নির্দেশটি দেখা যায় প্রায় পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত। সেখানে তার অর্থ সম্ভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত কোনো পাত্রের প্রবেশ। (১৯৬৮ সালে ইণ্ডিয়ান অরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের ২৪-তম অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ)

৬. ডঃ ভি রাঘবনের 'থিয়েটার আর্কিটেক্চার ইন এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় অভিনয়

প্রাচীন ভারতের রঙ্গমঞ্চে চিত্রিত দৃশ্যপটের কোনো স্থান ছিল না, এই মতটি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।[১] পিছনের যবনিকা দুটি চিত্রিত ও একরঙা হতে পারতো। নাট্যাভিনয়ে জোর দেওয়া হতো উপযুক্ত রস উদ্বোধনে। নানাবিধ দৃশ্য পাত্রপাত্রীর বর্ণনাত্মক উক্তির মধ্য দিয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হতো, বাদবাকি দর্শকদের কল্পনা করে নিতে হতো। মৃচ্ছকটিকের বর্ষার দৃশ্য বা মালতীমাধবের শ্মশানদৃশ্যের মতো উপভোগ্য দৃশ্যে চর্মচোখের কোনো মূল্য থাকতো না। শকুন্তলার দুষ্যন্ত রথে চড়ে মঞ্চে ঢুকতেন না, বা রথ থেকে নামতেন না, শকুন্তলার জলসেচনদৃশ্যে কোনো গাছ বা জলপাত্র ব্যবহার করা না হলেও ক্ষতি হতো না। অবশ্য পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বাচন-ভঙ্গির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। নাটক অভিনয়ে এইগুলির বিস্তারিত বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। এগুলি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ দর্শকের পক্ষে নাটকের রস গ্রহণ করা অবশ্যই খুব কষ্টকর ছিল।

নাটক অভিনয়ের পক্ষে খুব বড় জিনিস ছিল কক্ষাবিভাগ। মঞ্চে পাত্রপাত্রীর গতায়াত ও স্থাননির্দেশই ছিল কক্ষাবিভাগ। কক্ষাবিভাগ দিয়েই মঞ্চের উপর নাট্যের বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট হতো। কোনো একটি বিশেষ স্থানের ব্যাপারেও কক্ষাবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেমন কোনো একটি ঘরের ভিতর ও বাহির একই সঙ্গে বোঝাতে হলে, যারা আগে ঢুকবে তারা ঘরের ভিতরে এবং যারা পরে ঢুকবে তারা ঘরের বাইরে ধরে নিতে হবে। ঘরের ভিতরে যারা ঢুকেছে তাদের সঙ্গে

নতুন প্রবিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ বোঝাতে হলে, মঞ্চে ঢুকে ডানদিকে ফিরে তবে কথা বলতে হবে, তার আগে পর্যন্ত দেখতে পায় নি বলে ধরে নিতে হবে। প্রবেশ-নিষ্ক্রমণের ব্যাপারেও বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল। মঞ্চের উপর পরিক্রমণ একটা বড় জিনিস। পাশাপাশি পরিক্রমণ দিয়ে বুঝতে হবে সকলেই সমপর্যায়ের ; বেষ্টিত হয়ে পরিক্রমণ করলে বেষ্টিত পাত্রই শুধু উঁচু পর্যায়ের বুঝতে হবে। প্রেক্ষনিকারা পরিক্রমণ করবে প্রভুর আগে আগে। একই জায়গায় বেশিক্ষণ পরিক্রমণ করলে বোঝাবে অনেকদূর যাওয়া হলো। দূরত্বের কমবেশি পরিক্রমণের উপরেই নির্ভর করবে। খুব দূর দেশে গমন ঘটাতে হলে অঙ্কের সমাপ্তি হবে।

শাস্ত্রকার অভিনয়ের চারটি আবশ্যিক বিভাগ নির্দেশ করেছেন : আহার্য, আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক। নেপথ্য বা সাজসজ্জা ও তৎসংক্রান্ত জিনিসের সাহায্যে যে অভিনয় তার নামই আহার্য অভিনয়। অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে নাট্যবস্তু উদ্‌ঘাটন করার নাম আঙ্গিক অভিনয়। বাচিক অভিনয় কণ্ঠস্বরের যথোচিত ব্যবহার, আর নানা রূপ অবস্থা বা সত্ত্বের অভিনয় সাত্ত্বিক অভিনয়। নাট্যাভিনয়ের পক্ষে সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ।

ভরতের মতে অভিনয়ের নেপথ্য বা সাজসজ্জা চার ধরনের : পুস্ত, অলংকার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব। হাতি, ঘোড়া, রথ, পাহাড়, প্রাসাদ প্রভৃতির মডেল যা নাটকের প্রয়োজনে মঞ্চে হাজির করতে হতো তারই নাম পুস্ত। পুস্ত তিন ধরনের। যে সমস্ত জিনিস তৈরি হয় বাঁশের চাঁচাড়ি ('কিলিঞ্জ') উপর কাপড় ও চামড়া দিয়ে, তাদের নাম সন্ধিম। কোন কিছু যন্ত্রচালিত হলে তার নাম ব্যাজিম, কাপড় জড়িয়ে তৈরি কোনকিছু বেষ্টিম।

নাট্যের প্রয়োজনে বর্মচর্ম-ঢাল-অস্ত্রশস্ত্র কত অসংখ্য জিনিসের প্রয়োজন। সবকিছুরই মডেল বা পুস্ত নির্মিত হতো। অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল, ধ্বজদণ্ড, পাহাড়, গুহা, প্রাসাদ, হাতি-ঘোড়া, বিমান, বাড়ি-ঘর ইত্যাদির

মডেল বাঁশের চাঁচাড়ির কাঠামোয় কাপড় বা ওই ধরনের কোনো কিছুতে রং দিয়ে তৈরি হতো। কাপড় না পেলে তালপাতা বা মাদুর ব্যবহার করা হতো। এইসব পুস্তে লোহা, পাথর বা ওই ধরনের কোনো ভারি জিনিস ব্যবহার অনুচিত। অস্ত্রাদিও লোহার হবে না। বাঁশের চাঁচাড়ি, ঘাস, গালা ও ভেণ্ড বা ভাণ্ড দিয়ে চরিত্রের অনুপাতে অস্ত্রাদি তৈরি করতে হবে। নকল হাত-পা-মাথা তৈরি হবে ঘাস, মাদুর ও ভেণ্ড দিয়ে। মডেল তৈরিতে মাটি, মোম, গালা ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। ফুলফল, পাত্র প্রভৃতি গালা দিয়ে তৈরি হবে। নাটকের পক্ষে মুখোশেরও প্রয়োজন। এই মুখোশ ('প্রতিশির' বা 'পটী') তৈরি হবে ছাই ও তুষের সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে কাপড়ের উপরে প্রলেপ দিয়ে। রোদে বা আগুনে শুকিয়ে নিয়ে মুখোশে চোখ-কান-নাক আঁকতে হবে। নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় এইসব উপকরণগুলির কিছু কিছু তৈরি হতো অবিকল বাস্তব জিনিসের মতো, আবার কিছু কিছু তৈরি হতো প্রথাগত আকারে।

নাটক অভিনয়ে পুস্তের ব্যবহার কতখানি ব্যাপক ছিল তা বলা কঠিন। উদয়নচরিতে নকল হাতি ব্যবহারের কথা জানা যায়। মৃচ্ছকটিকে খেলনা-গাড়ি নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হতো; গরুর গাড়ি বদলের দৃশ্যে মঞ্চের উপর গাড়ির কল্পনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাল-রামায়ণে ও বিদ্ধশালভঞ্জিকায় যন্ত্রচালিত পুতুল ব্যবহার করা হতো নিশ্চয়ই। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র এবং ছোটখাটো জিনিসপত্র ছাড়া খুব বড় কোনো কিছু সাধারণত ব্যবহার করা হতো না বলেই মনে হয়। খুব ছোটখাটো উপকরণের ব্যাপারেও সাধারণভাবে পুস্ত ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল, আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে উপকরণগুলির অস্তিত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হতো।

আহার্য অভিনয়ের অপর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল অলংকার। মাল্য, বস্ত্র, আভরণ সবকিছুই অলংকারের মধ্যে পড়ে। পাত্রপাত্রীর চরিত্রানুযায়ী অলংকার ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে মাল্য

হবে বেষ্টিত, বিতত, সজ্ঝায়, গ্রন্থিম, প্রলম্বিত প্রভৃতি নানা ধরনের। অলংকারেরও প্রকারভেদ আছে। কিছু কিছু অলংকার ব্যবহারে অঙ্গভেদ প্রয়োজন, যেমন, কুণ্ডল। কোনো কোনো অলংকার বেঁধে নিতে হয়, যেমন, শ্রোণীসূত্র, অঙ্গদ। পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই অলংকার ধারণ সমান গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় অলংকার হচ্ছে মাথার চূড়ামণি, মুকুট, কানের কুণ্ডল, মোচক, কীল, গলার মুক্তাবলী, হর্ষক, সূত্র, কটক, আঙুলের অঙ্গুলীয় মুদ্রা, বাহু ও হাতের হস্তরী, বলয়, রুচিক, কেয়ুর, বুকের ত্রিশির, কোমরের তরল, স্বর্ণসূত্র। অবশ্য এতসব অলংকার রাজা অথবা পুরুষদেবতার পক্ষেই প্রয়োজন, অন্যের পক্ষে নয়। নারীর অলংকার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ('আকেশাদানখাদাপি')। কিন্তু বিভিন্ন ভাব-রস-অবস্থা বুঝে আগম অনুসারে দেহের অনুপাতে নারীচরিত্রের অভিনয়ে অলংকার ধারণ করতে হবে। খুব বেশি অলংকার পরাও অনুচিত। সোনার তৈরি বা সত্যিকারের অলংকার ব্যবহার করা চলবে না। অলংকার হবে গালার তৈরি ঝুঁটো মণিমুক্তো বসানো। দেবদেবীর অলংকার ধারণের কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই, কিন্তু মানুষের পক্ষে অপরিহার্য।

বস্ত্র অলংকরণের অঙ্গ। অলংকার ও বস্ত্রের ভিন্নতা দিয়েই চরিত্রের ভিন্নতা বোঝানো হতো। যেমন, বিদ্যাধরীদের মাথার চুল হবে চুড়ো করে বাঁধা ('শিখাপুটশিখণ্ডা'), গলায় মুক্তোর মালা, পরনে শুদ্ধ (সাদা) বস্ত্র; যক্ষী ও অপ্সরীরা মণিমানিক্য খচিত একই ধরনের অলংকার ধারণ করবে, কিন্তু শিখা শুধু যক্ষীদেরই থাকবে; নাগরমণীদের এসব ছাড়া থাকবে মাথার উপরে সাপের ফণা; মুনিকন্যারা একবেণীধরা হবে। সিদ্ধনারীদের বস্ত্র হবে হলুদ রঙের, অলংকার মরকতের। গন্ধর্বনারীদের হাতে থাকবে বীণা, পরনে কৌসুম্ভ (জাফরানি রঙের) বসন, অলংকার মণিখচিত। রাক্ষসীরা পরবে কালো রঙের বস্ত্র, ইন্দ্রনীলের অলংকার; দেবকন্যারা

বৈদুর্যমুক্তার আভরণ, মণির অলংকার আর নীল বস্ত্র। এই বস্ত্র ও আভরণের ভিন্নতা প্রাদেশিক ভেদ বোঝাবার পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কেশবিন্যাসও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবন্তীর যুবতীদের কেশ হবে কোঁকড়ানো (সাল-কুণ্ডল), গৌড়ের যুবতীদের আধা-কোঁকড়ানো, কিন্তু তাদের শিখাপাশ ও বেণী থাকবে। আভীর যুবতীদের থাকবে যুক্তবেণী, মাথায় গাঢ় নীল কাপড়ের ঘোমটা। পূর্বোত্তরের নারীদের থাকবে মাথার চুল পর্যন্ত আচ্ছাদন এবং মাথায় উঁচু শিখণ্ড। দক্ষিণের নারীদের কপালে উল্লেখ্য (উল্কি), কুম্ভীপদক আর আবর্ত। অন্যান্য চরিত্রের কেশ ও বেশের বিভিন্ন লক্ষণ বিভিন্ন দেশীয় রীতি অনুসারেই নির্দিষ্ট হবে। বিভিন্ন অবস্থাও এই বস্ত্র ও অলংকারের মাধ্যমে বোঝাতে হবে। প্রোষিতভর্তৃকা কখনোই অমলিন বস্ত্র পরবে না, একবেণী ধারণ ছাড়া অন্য কোনো রকম কেশবিন্যাস তার চলবে না। বিপ্রলম্ভার বেশ হবে সাদা, তার পক্ষে অলংকার ধারণ নিষিদ্ধ। জাতি, বর্ণ, বৃত্তি ও পদ অনুযায়ী এইভাবে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বেশভূষা নির্দিষ্ট।

অলংকারের পর অঙ্গরচনা। অঙ্গরচনা অর্থাৎ 'পেন্টিং'। বস্ত্রালংকারের মতোই অঙ্গরচনা বয়স, জাতি বা চরিত্রের বিভিন্নতা বোঝানোর পক্ষে অপরিহার্য ছিল এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী দুই প্রকার বিধিব্যবস্থাই ছিল। কালো, নীল, পীত ও লাল—এই চার প্রকার হচ্ছে অঙ্গরচনার মৌলিক বর্ণ বা রং। এদের বিভিন্ন মিশ্রণে বিভিন্ন উপবর্ণ তৈরি হতো, যেমন, সাদা ও হলদে মিশিয়ে পাণ্ডু (মতান্তরে সাদা ও নীল মিশিয়ে), সাদা ও নীল মিশিয়ে কপোত, সাদা ও লাল মিশিয়ে পদ্ম, নীল ও হলদে মিশিয়ে হরিৎ বা সবুজ। গৌর তৈরি হতো হলদে ও লাল মিশিয়ে, নীলের সঙ্গে লাল মিশিয়ে হতো কাষায়। এগুলি ছিল মুখ্য উপবর্ণ। এছাড়াও তিন চারটি রং মিশিয়ে আরও নানা ধরনের রং তৈরি হতো। তিনচার রকমের রং মিশিয়ে কোনো মিশ্রিত রং তৈরি

করতে হলে নজর রাখতে হতো বিভিন্ন রঙের উপাদানের উপরে। সেক্ষেত্রে জোরালো রঙের অনুপাত চার ভাগের একভাগ।

এইভাবে তৈরি রং দিয়ে চরিত্রানুযায়ী নটনটীর অঙ্গরচনা সম্পন্ন হতো। গায়ের রং দেখে বুঝতে হতো কে কোন জাতির বা চরিত্রের। শাস্ত্রমতে দেবতা, যক্ষ অপ্সরদের রং হবে গৌর। রুদ্র, অর্ক, দ্রুহিন এবং স্কন্দের সোনালি, গঙ্গার সাদা, মঙ্গলের লাল, বুধের ও হুতাশনের হলুদ, নারায়ণ, নর ও বাসুকির শ্যাম। দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গুহ্যক, পিশাচের রঙও শ্যাম হবে। এইরকম যক্ষ, গন্ধর্ব, ভূত, পন্নগ, বিদ্যাধরদেরও পৃথক পৃথক রং দেখে চিনতে হবে। মর্ত্যলোকের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যেও রঙের বিভিন্নতা আছে। ভারতবর্ষের রাজার রং হবে পদ্ম, শ্যাম বা গৌর; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের লাল; বৈশ্য ও শূদ্রের শ্যাম; কিরাত, বর্বর, আন্ধ্র, দ্রাবিড়, কাশী, কোশল, পুলিন্দ ও দাক্ষিণাত্যবাসীদের রং হতে হবে অসিত; শক, যবন, পহ্লব, বাহ্লিকদের গৌর; পাঞ্চাল, শূরসেন, মাহিষ, উড্র, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গের শ্যাম। এখানে লক্ষ করবার বিষয়, নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন জাতিকে যে-ভাবে গায়ের রঙের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে, অঙ্গরচনার রং তাদের যথার্থ গায়ের রং না হলেও গায়ের সত্যিকারের রঙের সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে। আন্ধ্র-দ্রমিল ছাড়াও দাক্ষিণাত্য-বাসীদের পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে এবং রঙের ক্ষেত্রে উত্তরের কাশী-কোশলকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

কেশ যেমন অলংকারের অঙ্গ, শ্মশ্রুরচনা তেমনি অঙ্গরচনার আবশ্যিক অঙ্গ। পার্থক্য এইটুকু যে, কেশরচনা পুরুষ-নারী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু শ্মশ্রুরচনা কেবলমাত্র পুরুষেরই। শ্মশ্রুরচনার মাধ্যমে পাত্রের দেশ, কর্ম ও বয়স বোঝানো হতো। শ্মশ্রু বা গোঁপ-দাড়ি ছিল তিন রকমের—শ্যাম, বিচিত্র ও রোমশ। ব্রহ্মচারী, অমাত্য, পুরোহিত, দীক্ষাগ্রহণকারীর শ্মশ্রু একেবারে পরিষ্কার অর্থাৎ কামানো থাকবে। বিদ্যাধর, সিদ্ধ, রাজা, রাজপুত্র, রাজকর্মচারী,

যৌবনগর্বিত বিলাসী ব্যক্তিদের শ্মশ্রু হবে বিচিত্র, দুঃখী ও তপস্বীদের শ্যাম এবং ঋষি, তাপস, দীর্ঘব্রতী ও প্রতিশোধকামীর রোমশ।

আহার্য অভিনয়ের সর্বশেষ অঙ্গ হলো সজীব বা জীবিত প্রাণী ব্যবহার। চতুষ্পদ, দ্বিপদ ও অপদ তিন রকমের সজীবেরই বিধি ছিল। সরীসৃপজাতীয় প্রাণী অপদ, পাখি দ্বিপদ আর বন্য বা গৃহপালিত পশু চতুষ্পদ। মঞ্চে জীবিত প্রাণী ব্যবহারের রীতি না থাকলে শাস্ত্রে উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে সর্বত্র যেভাবে নাট্যধর্মী অভিনয়ের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয় যে, বহুবিধ পুস্তের মতোই সজীবের ব্যবহারও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। তবু শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্কে মঞ্চস্থ একটি জীবিত হরিণই যে শকুন্তলার আঁচল ধরে টানছে, এহেন দৃশ্যকল্পনায় কোনো অসঙ্গতিই নেই।

নাট্যাভিনয়ে হাত-পা-মাথা প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বৈচিত্র ভঙ্গি অর্থাৎ আঙ্গিক অভিনয় অপরিহার্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন রস ও ভাবকে সুপরিস্ফুট করা না গেলে অভিনয় বহুলাংশে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। এইজন্য অঙ্গভঙ্গি বা আঙ্গিক অভিনয় সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রকার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রকার বিভিন্ন অঙ্গকে অঙ্গ ও উপাঙ্গ দুভাগে ভাগ করেছেন। তিনি প্রত্যঙ্গভেদ করেন নি। কিন্তু অভিনয়দর্পণের মতে অঙ্গ ও উপাঙ্গভেদ ছাড়াও প্রত্যঙ্গভেদ ছয় রকমের। মাথা, হাত, কটী, বুক, পাশ ও পা—এই ছয়টি অঙ্গ; উপাঙ্গও ছয়টি—চোখ, ভ্রূ, নাক, ঠোঁট, গাল ও চিবুক। এই বারোটি অঙ্গ ও উপাঙ্গের অভিনয়কে মুখজ, চেষ্টাকৃত ও শারীর—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

মুখজ অভিনয়ের মধ্যে পড়ে মুখ্যত মাথা ও চোখের বিভিন্ন ভঙ্গি। মাথার শিরঃকর্মের ভেদ তেরো রকম, অভিনয়দর্পণের মতে নয় রকম। এগুলির নাম—অকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, আধুতক, অবধূত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত

ও লোলিত। বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের জন্য এদের পৃথক প্রয়োগ। যেমন, সংজ্ঞা-নির্দেশ, উপদেশ, প্রশ্ন কিংবা স্বাভাবিক আলাপে মাথা উঁচু আর নিচু করতে হবে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উঁচুনিচু করলে হবে কম্পিত, রোষ বিতর্ক প্রভৃতিতে তার ব্যবহার। এইরকম অনিচ্ছা ও বিষাদে ধূত; শীত, ভয়, মত্ততায় বিধূত; বিস্ময়, হর্ষ, ক্ষমাহীনতায় পরিবাহিত প্রভৃতি শিরঃকর্মের প্রয়োগ। গ্রীবাকর্ম শিরঃকর্মের আনুষঙ্গিক কর্ম। গ্রীবাকর্মও নয় রকমের।

শিরঃকর্মের পর চোখের ভঙ্গি বা দৃষ্টিভেদ। দৃষ্টিভেদের ক্ষেত্রে চোখের তারা, পাতা, ভ্রূ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চোখের তারার ভঙ্গি (তারাকর্ম) নয় রকমের, পাতার ভঙ্গিও (পুটকর্ম) তাই। ভ্রূর ভঙ্গি (ভ্রূকর্ম) সাত রকমের। কিন্তু চোখের তারা, পাতা ও ভ্রূ মিলিয়ে যে দৃষ্টি তার ভেদ ছত্রিশ রকমের। কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুতা, রৌদ্রী, বীরা, বীভৎসা—এই আট রকম রস-দৃষ্টি; স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা, বিস্মিতা—স্থায়ীভাব-দৃষ্টি; শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা প্রভৃতি কুড়ি রকম সঞ্চারীভাব-দৃষ্টি। এছাড়াও আরও আট রকম দৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখজ ভঙ্গির মধ্যে নাক, গাল, ঠোঁট ও চিবুকের ভঙ্গিও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কান্না, অধৈর্য, সু ও কু গন্ধ বোঝাতে নাকের ভঙ্গি না করলে চলে না। সেইরকম গর্ব, বেদনা, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে ঠোঁটের ভঙ্গি অপরিহার্য। চিবুকের ওঠানামা ও বিভিন্ন ভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে হয় শীত, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রকমফের আছে। মুখের বিভিন্ন রং বিভিন্ন রসপ্রকাশের সহায়ক। ভরত বলেন: "অঙ্গ ও উপাঙ্গের ভঙ্গির সঙ্গে মুখের রং (রাগ) যদি সঙ্গতি না রাখতে পারে, তাহলে অভিনয় শোভান্বিত হয় না। রং যদি সুসঙ্গত হয়, তাহলে চাঁদ-ওঠা রাতের মতো অভিনয় দ্বিগুণ শোভান্বিত হয়ে ওঠে।"

চেষ্টাকৃত বলতে হাতের ভঙ্গি বা হস্তাভিনয় বোঝায়।

অভিনয়ে প্রকাশ হয় রস ও ভাব, হস্তাভিনয়ে অর্থ। অভিনয়ে দুরকম হাতের ব্যবহার করা হয়। একখানি হাত ব্যবহার করলে তার নাম অসংযুত, দুখানি একসঙ্গে ব্যবহার করলে সংযুত। অসংযুতহস্ত চব্বিশ রকম এবং সংযুতহস্ত তেরো রকম। যেমন, অসংযুত হাতের একটি ভঙ্গি পতাক। এই ভঙ্গিতে হাতের আঙুলগুলি প্রসারিত ও পরস্পর সংলগ্ন এবং বুড়ো আঙুল বাঁকানো! কিন্তু দুই পতাকহস্ত মিললে হবে সংযুতহস্তের অঙ্গুলিমুদ্রা। পতাকহস্ত দিয়ে বোঝানো যায় প্রহার, প্রেরণা, তাপ ইত্যাদি। পতাকহস্ত কপালে ঠেকিয়ে গর্বপ্রকাশ, নিচের দিকে হাত আঙুল দিয়ে ওঠানামা করালে হাওয়া, তরঙ্গ ইত্যাদি। অঞ্জলিহস্ত মাথায় ঠেকালে হয় দেবপ্রণাম, মুখে গুরুপ্রণাম, আর বুকে ঠেকালে হয় মিত্রের অভিবাদন। এছাড়া সংযুতহস্তের মধ্যে পড়ে আরও তিরিশ রকমের নৃত্তহস্ত। নৃত্তহস্ত নামেই বোঝা যায়, এগুলি মুখ্যত নৃত্যের জন্য। কিন্তু অভিনয়ের সৌকর্যার্থে এদের প্রয়োগও বহুক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। এইজন্যই নাট্যশাস্ত্রে নৃত্তহস্তের প্রয়োগও বর্ণনা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে হস্তাভিনয় সাতষট্টি প্রকার।

যে-কোনো অর্থাভিনয়ে হাতের মুদ্রা বা ভঙ্গি ব্যবহার করা চলতে পারে। নির্দিষ্ট মুদ্রা ছাড়াও হাতের বিভিন্ন লৌকিক মুদ্রা আছে। ভাব ও রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভরত তাদের যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতে উত্তম পাত্রের অভিনয়ে হস্তাভিনয় স্বল্প, মধ্যমের অভিনয়ে মাঝামাঝি হওয়া উচিত। কেবলমাত্র অধম পাত্রের অভিনয়ে খুব বেশি করা চলতে পারে। উত্তম ও মধ্যমকে মূলত শাস্ত্রনির্দিষ্ট অভিনয়ের নিয়ম মানতে হবে, অধমেরা স্বাভাবিক বা লৌকিক যে-কোনো নিয়ম মানতে পারে। তবে কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে অভিনয়ে হাতের ভঙ্গি অনুচিত। যেমন, ভয়, বেদনা মূর্ছা, শীতের প্রকোপ, মত্ততা, তপস্যা, স্বপ্নে কথাবলা, বন্দীদশা প্রভৃতি অবস্থার অভিনয়ে। এসব ক্ষেত্রে

অবস্থার অনুকৃতি এবং ভাব ও রসের উপযুক্ত বাচিক অভিনয়ের উপর জোর দিতে হবে।

শারীর অভিনয়ের মধ্যে পড়ে বুক, পেট, পাশ, কোমর, উরু জঙ্ঘা ও পায়ের অভিনয়। নাট্যশাস্ত্রে পেট ছাড়া আর সবকটির অভিনয়ই পাঁচ রকমের, পেটের ভঙ্গি তিন রকমের। পায়ের বিভিন্ন ভঙ্গির সঙ্গে কোমর, উরু জঙ্ঘার ভঙ্গি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। এদের যুগপৎ চালনার নাম চারী। অভিনয়ে চারীর গুরুত্ব খুব বেশি।

চলাফেরা, অস্ত্রত্যাগ, যুদ্ধ প্রভৃতির অভিনয়ে চারীর ব্যবহার। চারী ছাড়া নাট্যের কোনো অঙ্গই কখনো সম্ভব নয়। চারীকে ভৌম ও আকাশিকী—এই দুই ভাগে করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকেই ষোলো রকমের। বিভিন্ন চারীর সংযোগে মণ্ডলের সৃষ্টি। বিশিষ্ট ভঙ্গিতে শরীর সংস্থাপন ও স্থিতিই মণ্ডল। মণ্ডলেরও আকাশগামী ও ভূমিক নামে দুটি ভেদ।

অভিনয়ের সময় পাত্রপাত্রীর দাঁড়ানোর ভঙ্গির নাম স্থান। স্থান ছয় রকমের—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়। বৈষ্ণবস্থানের প্রয়োগ উত্তম পাত্রের স্বাভাবিক কথাবার্তায়, ধনু-র্ধারণে, প্রণয়কোপ প্রভৃতিতে ; সমপাদের প্রয়োগ ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ, পাখির অনুকৃতি, আকাশস্থ ব্যক্তি, ব্রতচারী প্রভৃতির অভিনয়ে ; ঘোড়ায় চড়া, ব্যায়াম, ধনুক বাঁকানো প্রভৃতিতে বৈশাখ ; মণ্ডল হাতিচড়া, ধনুক ও বজ্রের ব্যবহারে। বীর ও রৌদ্র রসের অভিনয়ে বিভিন্ন অবস্থায় আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়ের প্রয়োগ। এইসব স্থানের সময় 'সৌষ্ঠবাঙ্গের' দিকে যথাযথ দৃষ্টি রাখা উচিত। 'সৌষ্ঠবাঙ্গ' ব্যতিরেকে নৃত্য বা নাট্য শোভাময় হয় না। নড়াচড়া না-করলে, কুঁজো না-হলে, খুব বেশি সোজা বা বাঁকা না-হলে, স্বচ্ছন্দভাবে অবস্থানের মধ্যে 'সৌষ্ঠবাঙ্গ' বজায় থাকে। কোমর, কান, কনুই, কাঁধ আর মাথা স্বাভা-বিক এবং বুক একটু উঁচু থাকলে অঙ্গের সৌষ্ঠব অব্যাহত থাকে।

রঙ্গমঞ্চে পাত্রপাত্রীদের গতি অর্থাৎ আসাযাওয়ার সময় পা-ফেলার নিয়মগুলিও নির্দিষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্নভাবে পা-ফেলার বিধি। যেমন, রাজা বা দেবতারা পা ফেলবে চার তাল অন্তর, উত্তম ও মধ্যম পাত্রেরা পা ফেলবে দু তাল অন্তর, নারী এবং অধম পাত্রেরা এক তাল অন্তর। পা-ফেলার কালপরিমাণ ও গতিবেগেরও পার্থক্য আছে। উত্তম পাত্রেরা ধীরে ধীরে, মধ্যমেরা তার চেয়ে জোরে এবং অধমেরা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি চলবে। কিন্তু চলাফেরার এইসব বিধি কেবলমাত্র স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিভিন্ন ভাব ও রসের অভিব্যক্তির তারতম্য অনুসারে প্রতি পাত্রের নির্দিষ্ট গতির ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। চলাফেরা ছাড়াও রঙ্গমঞ্চে বসা ও শোয়া সম্পর্কে বিধিনিষেধ আছে।

নাট্যাভিনয়ে পাত্রপাত্রীর সংলাপ বা কথাবার্তাই সবচেয়ে বড় জিনিস, কারণ সংলাপহীন নাট্যাভিনয় সম্ভবই নয়। ভরত বলেন: "বাক্য হচ্ছে নাট্যের দেহ. আঙ্গিক আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয় বাক্যের অর্থকেই পরিস্ফুট করে।" অভিনয়ে বাক্যের অর্থকে ভাব-রস অনুযায়ী প্রকাশ করতে হলে ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। নাট্যশাস্ত্রে তাই বাচিক অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যাকরণ ও মৌলিক লক্ষণগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুটি ভাষাই ব্যবহার করার বিধি। কিন্তু দুয়েরই পাঠ্যের প্রকৃতি বহুলাংশে পৃথক। পাঠ্যের গুণাগুণ বিবেচনার সময় সাতটি স্বর, তিনটি স্থান, চারটি বর্ণ, দুটি কাকু, ছয়টি অলংকার ও ছয়টি অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।

সাতটি স্বর হচ্ছে—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাধ। হাস্য ও শৃঙ্গারে পাঠ্যের স্বর হবে মধ্যম ও পঞ্চম; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুতে ষড়জ ও ঋষভ; করুণে গান্ধার ও নিষাধ; বীভৎস ও ভয়ানকে ধৈবত।

স্বরের তিনটি স্থান—উরস্, কণ্ঠ ও শির থেকে মন্দ্র, উদার ও তার

স্বর। কাছের, অল্পদূরের এবং অনেক দূরের কাউকে সম্বোধন করতে যথাক্রমে মন্দ্র ও তার স্বর ব্যবহার করতে হয়।

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত এই চারটি বর্ণের মধ্যে হাস্য ও শৃঙ্গারে স্বরিত ও উদাত্ত স্বর উপযোগী ; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুতে উদাত্ত ও কম্পিত;করুণ, বীভৎস ও ভয়ানক রসেরউপযোগীস্বরিত ও কম্পিত।

বাক্যের ভাব ও রসগত অর্থ পরিস্ফুট করতে কাকু, অলংকার ও অঙ্গগুলি মূল্যবান। শাস্ত্রকার এদের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। কাকু হলো স্বরের ভঙ্গি। উচ্চ, নীচ, দীপ্ত, মন্দ্র, দ্রুত ও বিলম্বিত হলো স্বরের সাতটি অলংকার। নানা রকম ভাব ও অবস্থা বোঝাতে এদের ব্যবহার। হাস্য, করুণ ও শৃঙ্গারে বিলম্বিত ; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুতে দীপ্ত ; ভয়ানক ও বীভৎসে দ্রুত ও নীচ স্বরের বিধি। স্বরের অঙ্গের মধ্যে 'বিচ্ছেদ' নাম হয়েছে বিরামের জন্য ; 'অর্পণে'র অর্থ সুললিত স্বরগ্রামে আবৃত্তি করে রঙ্গভূমি পূর্ণ করা ; কোনো বাক্যকে শেষ করা 'বিসর্গ' ; বাক্যের পদগুলি বিশ্লিষ্ট না করে অর্থানুযায়ী আবৃত্তির নাম 'অনুবন্ধ' ; মন্দ্র, উদার ও তার স্বরকে ক্রমশ উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়া 'দীপন' ; 'প্রশমন' অর্থ উচ্চগ্রাম থেকে সহজে নিচে নামা। হাস্য ও শৃঙ্গাররসের আবৃত্তিতে অর্পণ, বিচ্ছেদ, দীপন ও প্রশমন থাকা চাই : করুণ রসে থাকা চাই দীপন ও প্রশমন ; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুতে থাকবে বিচ্ছেদ, প্রশমন, দীপন ও অনুবন্ধ ; আর বীভৎস ও ভয়ানকে বিসর্গ ও বিচ্ছেদ।

এসব ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রে 'বিরাম'কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পদ্য আবৃত্তিতে ছন্দের যতি অনুযায়ী বিরতি অনুসরণ করলে অর্থগ্রহণে যে বাধা ঘটে তা তো জানা কথা। সুতরাং বিরতির ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। বিরতি ঘটবে অর্থানুযায়ী। যেমন, বিপ্রলব্ধা নায়িকার এই উক্তিটি ঃ

কিং গচ্ছ মা বিশ সুদুর্জনবারিতোঽসি।
কার্যম্ ত্বয়া ন মম সর্বজনোপভুক্তঃ ।।

এখানে আবৃত্তিতে অর্থানুযায়ী বিরতি ঘটবে, ছন্দ অনুযায়ী নয়। বিরতি হবে এইরকম : কিং। গচ্ছ। মা বিশ। সুদুর্জন-বারিতোঽসি। কার্যম্ ত্বয়া ন মম। সর্বজনোপভুক্তঃ। ঠিক জায়গায় বিরতি ঘটলেই তবে অর্থ পরিষ্কার হয়। অর্থ যদি পরিষ্কার না হয়, তাহলে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

মোটামুটি সাত্ত্বিক অভিনয় বলতে বোঝায়, নানা রকম শারীরিক অবস্থার অভিনয়। সাত্ত্বিক ভাব আটটি : স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বৈবর্ণ, রোমাঞ্চ, স্বরসাদ, ও মূর্ছা। বিভিন্ন ভাব ও রসের অভিব্যক্তিতে শরীরে এই সাত্ত্বিক লক্ষণগুলি দেখানোর অভিনয়ই সাত্ত্বিক অভিনয়। ভরত বলেন : "সত্ত্ব হচ্ছে অব্যক্তরূপ, কিন্তু স্থানপোযোগী রোমাঞ্চ, অশ্রু ও অন্যান্য চিহ্নের দ্বারা এবং রসের সঙ্গে সুসঙ্গত হয়ে বিভিন্ন ভাব রসকে আশ্রয় করে থাকে।" সাত্ত্বিক অভিনয়ের মধ্যে নারীর হাব, ভাব, হেলা প্রভৃতি যৌবনসুলভ বিভিন্ন প্রয়োগকে 'অলংকার' বলে ধরা হয়েছে। এদের সংখ্যা কুড়িটি। অভিনয়ে সম্পূর্ণতা দানে এদের মূল্য অপরিসীম।

সাত্ত্বিক অভিনয়কে আঙ্গিক অভিনয় থেকে পৃথক করা যায় কি না তর্ক উঠতে পারে। বাহ্যদৃষ্টিতে এ পার্থক্য অবান্তর ও অবৈজ্ঞানিক বলেও মনে হতে পারে।[২] সাত্ত্বিক অভিনয় হচ্ছে ভাব ও রস অনুযায়ী দৈহিক অবস্থার অভিনয়, আর আঙ্গিক অভিনয় হচ্ছে ভাব ও রস প্রকাশের উপযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ অভিনয় বা ভঙ্গি। এ দুয়ের সীমারেখা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু অবান্তর মোটেই নয়, অবৈজ্ঞানিক তো নয়ই। ভরত বলেন : "সত্ত্ব মনঃ-প্রভব।" মন সমাহিত না হলে সত্ত্বনিষ্পত্তি হয় না। অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "সত্ত্ব ও চিত্তের একাগ্রতা একই বস্তু।" চিত্তের একাগ্রতা বা সমাহিতি ছাড়া রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বেদ, বৈবর্ণ্যের অভিনয় কোনো রকমেই সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে আঙ্গিক অভিনয়গুলি নিছক অঙ্গ-ভঙ্গিতেই পর্যবসিত হয়। এখানেই সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের

পার্থক্য। সাত্ত্বিক অভিনয় আঙ্গিক অভিনয় বটে, তবে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু।

টীকা

১. প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে চিত্রিত দৃশ্যপটের সমর্থন কোথাও নেই। পর্দা বা curtain চিত্রিত হবার পক্ষে বাধা ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু চিত্রিত দৃশ্যপট নিঃসন্দেহে অন্য জিনিষ বোঝায়। সামনের পর্দা সরলে নেপথ্যের দুই দরজার মাঝখানের অংশ, যা মঞ্চের পশ্চাদপট, তা চিত্রিত হতো কি? এ সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন জেগেছে বামনের বিখ্যাত সূত্রটির প্রকৃত অর্থনির্ধারণ প্রসঙ্গে। বামন বলেছেন: সন্দর্ভসমূহের মধ্যে নাটক শ্রেষ্ঠ। কেন? "তদ্ধি চিত্রং চিত্রপটবৎ বিশেষসাকল্যাৎ" (কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি, ১।৩)। এই "চিত্রপটবৎ" কথাটির অর্থ এতকাল করা হয়েছে "চিত্রপটের ন্যায়"। "বৈশিষ্ট্যসমূহ সমগ্ররূপে থাকায় তাহা চিত্রপটের ন্যায় বিচিত্র" (ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—কাব্যালোক, পৃঃ ৬৭)। কিন্তু যদি "চিত্রপটযুক্ত" (চিত্রপট+মতুপ, ক্লীব) অর্থ করি, তাহলে, অর্থ হয়: "এতে চিত্রপট ইত্যাদি বিশেষত্বগুলি সবই থাকে বলে এ বৈচিত্র্যময়।" অভিনবগুপ্ত ভরতের রসসূত্রের ব্যাখ্যায় যেখানে এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন তার পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকে, বৃত্তি এবং গোপেন্দ্রতিপ্প ভূপালের টীকা থেকে এই অর্থই সমর্থিত হয় বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে মৎকৃত অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য, পৃঃ ১২৬-২৭, ১২৯ দ্রষ্টব্য।

২. কীথ্ মনে করেন।

সংস্কৃত নাটকের অভিনয়

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন অভিনয়ের খুঁটিনাটির বিস্তারিত বর্ণনার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, নাটকের যথার্থ অভিনয়ে এদের কেমন-ভাবে প্রয়োগ করা হতো, কতদূর প্রয়োগ করা হতো। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া বিবরণ ও উল্লেখ সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, সংস্কৃত নাটকের প্রাচীন অভিনয়পদ্ধতির নিখুঁত সম্পূর্ণ রূপটি আজ আর জানা সম্ভব নয়; এবং এক্ষেত্রে অনেকখানি কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া হয়তো কোনো উপায়ও নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে, সম্পূর্ণ না হোক নাট্যশাস্ত্রের বর্ণনার মধ্যেই সংস্কৃত নাটকের অভিনয়পদ্ধতির প্রকৃত রূপটি খুঁজে পাওয়া যাবে। দেশ, কাল ও রুচিভেদে অভিনয়পদ্ধতির ছোটখাটো অনেক কিছুর হয়তো পরিবর্তন ঘটেছিল—এবং তা ঘটাই স্বাভাবিক—কিন্তু মৌলিক রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে হয় না। বিতর্ক এড়িয়ে তাই নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করলেই প্রাচীন অভিনয়-পদ্ধতির প্রকৃত পরিচয়টুকু পাওয়া যাবে। আর মনে হয়, সেই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট।

সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে প্রকৃত নাটকটি শুরু হবার আগে একটি আবশ্যিক কৃত্য ছিল। নাটকের লিখিত অংশের মধ্যে এর কোনো স্থান নেই। কিন্তু একে বাদ দিয়ে প্রাচীন কালে নাটক অভিনয়-হবার কোনো উপায় ছিল না। এর নাম 'পূর্বরঙ্গ'। মঞ্চে বা রঙ্গে পূর্বে কৃত্য বলেই এই নাম। একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদে ভরত এই 'পূর্বরঙ্গ' বর্ণনা করেছেন।

সর্বপ্রথম বাদ্যযন্ত্রগুলি সাজিয়ে নিয়ে বাদক ও গায়কেরা রঙ্গমঞ্চে সমবেত হতো; তারপর যন্ত্রগুলির ঘাট বেঁধে, বোল তুলে প্রস্তুতির পালা। কিছুক্ষণ যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীত চলতো। এর সঙ্গে নাচের তাল মিলতো। তারপর উঠতো সামনের যবনিকা। তখন যথোচিত তাল-লয়ে একটি 'ধ্রুবা' গাওয়া হতো। গানের সঙ্গে হতো 'তাণ্ডব' নাচ। নাচ শেষ হলে একটি গানের মধ্যেই ঢুকতো সূত্রধার দুজন 'পারিপার্শ্বিক' বা সহকারীকে নিয়ে। এদের একজনের হাতে থাকতো সাদা ফুল আর জলভরা সোনার পাত্র, অপর জনের হাতে 'জর্জরদণ্ড'। দুজনের পরনেই সাদা কাপড। তিনজনে নানারকম ভঙ্গি করে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করতো। এরপর আচমন করে শুদ্ধ হয়ে সূত্রধার হাতে নিতো 'জর্জরদণ্ড'টি। সেটি হাতে করেই যন্ত্রসংগীতের তালে তালে নানারকম ভঙ্গিতে পা ফেলে দিকপালদের প্রণাম জানাতো। সঙ্গে 'ধ্রুবা' গানও চলতো। এমন সময় ফুল নিয়ে চতুর্থ ব্যক্তি ঢুকতো। সে বাজনার তালে তালে পা ফেলে 'জর্জরদণ্ড', বাদ্যযন্ত্র ও সূত্রধারের পূজা করে চলে যেতো। তখন 'চতুরস্র'-তাল ও 'স্থিতলয়ে' একটি 'ধ্রুবা' গাওয়া হতো।

'ধ্রুবা'র পর 'নান্দী'। 'নান্দী' পাঠ করতো সূত্রধার। 'নান্দী'তে থাকতো দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা, নাটকের প্রযোজক, নাট্যকার, দর্শক প্রভৃতির স্তুতি ও শুভকামনা। এরপর 'রঙ্গদ্বার'। এখান থেকেই অভিনয়ের সূত্রপাত। সূত্রধার 'জর্জরের' স্তুতিমূলক একটি শ্লোক পাঠ করে 'চারী' নাচতো। 'চারী' শেষ হলে 'পারিপার্শ্বিকে'র হাতে জর্জরদণ্ডটি দিয়ে আবার 'মহাচারী' নাচতো। এই নাচ ও গানের পর সূত্রধার 'পারিপার্শ্বিক'দের ডাক দিতো। এদের দুজনের সঙ্গে সূত্রধারের যে কথাবার্তা হতো তার নাম 'ত্রিগত'। ক্ষেত্রবিশেষে বিদূষকও হাজির হত। এদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সূত্রধার নাটকের বিষয়বস্তু ঘোষণা করতো। একে বলা হতো 'প্ররোচনা'। তারপর সূত্রধার ও 'পারিপার্শ্বিকে'রা মঞ্চ ত্যাগ করে গেলে'পূর্বরঙ্গ'শেষ হতো।

'পূর্বরঙ্গে'র এই বিস্তৃত অনুষ্ঠানটিকে যে নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে সহজেই দীর্ঘায়িত করা যায়, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ভরত সতর্ক করে দিয়েছেন, 'পূর্বরঙ্গ' দীর্ঘ হলে চলবে না। কারণ, তাহলে নটেরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, ক্লান্ত হয়ে পড়বে দর্শকেরাও। ক্লান্ত হলে রস ও ভাব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় না, তার ফলে শেষ পর্যন্ত অভিনয় উপভোগ্য হয়ে ওঠে না। তিনি 'পূর্বরঙ্গ' সংক্ষেপ করার বিধি দিয়েছেন। পরবর্তী কালে অনেকে 'পূর্বরঙ্গে'র অনেক অঙ্গ বাদ দিতেই বলেছেন। ধর্মকৃত্য ছাড়াও 'পূর্বরঙ্গে'র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দর্শকমনকে প্রস্তুত করা এবং নাট্যাভিনয়ের অনুকূল পরিমণ্ডল গড়ে তোলা।

সূত্রধারের পরে মঞ্চে ঢুকতো 'স্থাপক'। গুণ ও আকৃতিতে 'স্থাপক' হতো সূত্রধারের মতোই। মঞ্চে ঢুকে সূত্রধারের মতোই নানা রকমের পাদচারণা করতো। সময়োপযোগী মধ্যলয়ে একটি 'ধ্রুবা' গান হলে 'স্থাপক' 'চারী' নাচের মধ্যে দিয়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করতো, সঙ্গে সঙ্গে শ্লোক আবৃত্তি করতো। এসব শেষ হলে স্থাপক 'প্রস্তাবনা'র সূত্রপাত করতো।

'প্রস্তাবনা' অংশটি নাটকের লিখিত অংশের মধ্যে পড়ে। 'প্রস্তাবনা'র ব্যাপারটির মধ্য দিয়ে সুকৌশলে মূল নাটকের অভিনয় শুরু করিয়ে দেওয়া হতো। 'পারিপার্শ্বিক', প্রধানা নটী অথবা বিদূষকের সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও উপভোগ্য কথোপকথনের মাধ্যমে এই ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হতো। কিন্তু সংস্কৃত নাটকগুলিতে দেখা যায়, প্রস্তাবনার ভার সূত্রধারের উপর। 'স্থাপক'কে পাই মাত্র দুটি নাটকে। ধনঞ্জয়ের দশরূপে 'স্থাপকের' ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু 'প্রস্তাবনা'র কথোকথনের সময় আবার সূত্রধারেরই উল্লেখ করা হয়েছে। আরও পরবর্তী কালের সাহিত্যদর্পণে দেখা যায় সূত্রধার নিজের ও 'স্থাপকে'র—দুজনের কাজই করছে। সাহিত্যদর্পণকার স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর সময়ে 'পূর্বরঙ্গে'র 'সম্যক প্রয়োগে'র অভাব

ছিল বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'স্থাপক'কে গুণ ও আকৃতিতে সূত্রধারের মতো হতে হবে। পরবর্তী কালে সুবিধার জন্য একই গুণসম্পন্ন সূত্রধার ও 'স্থাপক'কে মঞ্চে না এনে সূত্রধারকে দিয়েই 'স্থাপকে'র কাজ করিয়ে নেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। এ ছাড়া সংস্কৃত নাটকগুলিতে দেখা যায়, 'নান্দী'র পরেই 'প্রস্তাবনা' শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রেও মনে হয়, পরবর্তী কালে 'পূর্বরঙ্গ' সংক্ষেপ করে 'নান্দী', 'প্ররোচনা' ও 'প্রস্তাবনা'কে সংহত করে নেওয়া হয়েছিল এবং 'নান্দী'ও নাটকের লিখিত অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

'প্রস্তাবনা'র কথোপকথন-প্রসঙ্গে নাটকের প্রকৃত অভিনয় শুরু করিয়ে দেওয়া বা নাটকের কোনো পাত্র-পাত্রীকে মঞ্চে ঢুকিয়ে দেওয়ার কৌশল ছিল মুখ্যত তিন ধরনের। সূত্রধারের মন্তব্যের কোনো সূত্র ধরে নাটকের পাত্র 'যবনিকা'র আড়াল থেকে মঞ্চে ঢুকে পড়লে তাকে বলা হতো 'কথোদ্‌ঘাত'। যেমন, রত্নাবলীতে নটীর উদ্দেশ্যে সূত্রধারের সান্ত্বনাবাক্যের সূত্রধরে মন্ত্রীর প্রবেশ ; ভট্টনারায়ণের বেণীসংহারে ভীমের প্রবেশও এইরকম 'কথোদ্‌ঘাত' আশ্রয় করে। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করে সূত্রধার কারও উল্লেখ করলে (কালসাম্য-সমাকৃষ্ট) সেই পাত্র বা পাত্রী মঞ্চে ঢুকলে তার নাম 'প্রবর্তক'। এর উদাহরণ রাজশেখরের প্রিয়দর্শিকায় মিলবে। সূত্রধার সোজাসুজি কোনো পাত্রের প্রবেশ উল্লেখ করলে হয় 'প্রয়োগাতিশয়'। কালিদাসের শকুন্তলায় দুষ্মন্তের প্রবেশ এই রীতিতেই। এগুলি ছাড়াও অন্যপ্রকারের কৌশলও আছে। 'প্রস্তাবনা'র মুখ্য উদ্দেশ্য, অজ্ঞাতসারে দর্শককে বাস্তব থেকে অতি সহজে কল্পনার জগতে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই ধরনের কৌশল-প্রয়োগে সব নাট্যকারই যে সার্থকতা লাভ করেছেন একথা বলা যায় না। বলা বাহুল্য, এটা নির্ভর করে নাট্যকারের নৈপুণ্যের উপর।

এরপর থেকে নাটকের প্রকৃত অভিনয় ঠিক কেমন হতো তা শাস্ত্রের নির্দেশ ও বিধিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনেকখানি কল্পনা করে নিতে হবে। এমন কোনো নিদর্শন আমাদের হাতে নেই যা থেকে কোনো একটি নাটকের অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। নাটক অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত একটিমাত্র বিবরণ পাওয়া গিয়েছে দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমতে। নাটকখানি "অনঙ্গহর্ষ" (?) বা হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের রত্নাবলী। কিন্তু বিবরণ শুধু প্রথম অঙ্কের অভিনয়ের। দামোদরগুপ্ত অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। তিনি ছিলেন কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (খ্রীঃ অঃ ৭৭৯-৮১৩) মন্ত্রী। তাঁর বিবরণ প্রামাণিক বলেই মানতে হবে।

বিবরণটি এই রকম। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় বারাণসীর বৃষভধ্বজের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। দেবরাষ্ট্রের রাজা সিংহভট্টের পুত্র সমরভট্টের প্রীত্যর্থে সেখানে নাট্যাচার্য রত্নাবলীর একটি অঙ্ক অভিনয় করছে। অভিনয় হচ্ছে মন্দিরের 'সমাজে'।

বাঁশির সুরে সুর মিলিয়ে 'প্রবেশিকবাদ্য' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'দ্বিপদীলয়ে' সূত্রধার প্রবেশ করল। সে উৎসাহভরে দর্শকদের (সামাজিক) মনোরঞ্জন করে, কবিনৈপুণ্য, বৎসেশ্বরের চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাল-লয়যুক্ত 'অষ্টকালপরিমাণধ্রুবা' গেয়ে নটীকে ডাকল। তার সঙ্গে সাংসারিক কাজের বিষয় নিয়ে আলাপের পর পাত্রের আগমনসূচক কয়েকটি 'ললিত' পদ আবৃত্তি করে নিঃসরণ-গীতের সঙ্গে গৃহিণীকে নিয়ে প্রস্থান করল। তারপর কথোদ্‌ঘাত আশ্রয় করে অমাত্য (যৌগন্ধরায়ণ) প্রবেশ করল। সে 'দুর্ঘট-সংঘটনে' (রত্নাবলীর উদ্ধারে) বিস্মিত এবং রাজার 'সৌভাগ্য উদয়ে' (বিবাহসম্ভাবনায়) আনন্দিত। মদনোৎসবের 'চর্চরী' দেখবার জন্য বয়স্যের সঙ্গে বৎসরাজ যে প্রাসাদের চূড়ায় উঠেছে তা 'নির্দেশ' করে 'কার্যসিদ্ধির' (বিবাহ-ঘটানো) জন্য প্রস্থান করল।

এরপর বসন্তকের সঙ্গে প্রাসাদচূড়ায় উদয়নের প্রবেশ। প্রজাদের আনন্দে ও নিজের সুখসমৃদ্ধিতে হৃষ্ট হয়ে বিস্মিত বিহ্বল উদয়ন প্রফুল্ল দৃষ্টিতে নাচগানে-মত্ত পৌরজনকে দেখতে দেখতে দীর্ঘ শ্লোকে বসন্তককে তার বর্ণনা করল। তারপর বসন্তকের দ্বারা 'নির্দিষ্ট' হয়ে হাতের 'সরোজবর্তনমাত্রা'য় (কমলবর্তনমুদ্রা) মদনের বাণের ইঙ্গিত আর বীররস প্রকাশ-পাওয়া দুই চোখে মদনের ধনুর দ্যোতনা করে, মত্তের মতো এলোমেলো পা-ফেলার অভিনয় (মদস্খলনচরণবিঘটিতাভিনয়) করতে করতে বাসবদত্তার প্রেরিত দুই চেটী নাচতে নাচতে প্রবেশ করল। উদয়নের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরল। কৌতুকাকৃষ্ট মনে রাজা একটি শ্লোকে তাদের নাচের বিস্তৃত বর্ণনা করল। উদয়ন বসন্তককে নাচতে বলতেই সে মহাস্ফূর্তিতে মনোরম ভাব প্রকাশ করতে করতে 'চর্চরী'র তালে তালে নাচতে লাগল। এই রকম ধীর, ললিত ও উদ্ধত ভঙ্গিতে নাচের পর চেটীরা উদয়নকে বাসবদত্তার আমন্ত্রণ জানাল। জানাতে গিয়ে প্রথমে বলল, "দেব, দেবী এই আদেশ করেছেন—" বলেই মাঝপথে থেমে সলজ্জভাবে এ-ওর মুখের দিকে তাকাল, পরে বলল, "না-না প্রণাম করে সবিনয়ে জানাচ্ছেন যে"—ইত্যাদি। উদয়নকে বলার পর 'প্রকৃতি', 'বয়স' ও 'কালের' উপযুক্ত ভঙ্গিতে 'মদ ও মদনাবিষ্ট' দুই চেটী 'যবনিকা'র অন্তরালে চলে গেল।

তারপর আবার 'তিরস্করিণী' সরে গেলে কাঞ্চনমালার সঙ্গে প্রবেশ করল বাসবদত্তা। এবং একটু পিছনে তার অজ্ঞাতে পূজার উপকরণ হাতে সাগরিকা। সাগরিকাকে দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ বাসবদত্তা পরিজনদের অসতর্কতার নিন্দা করে পরিচারিকা কাঞ্চনমালাকে বলল, সাগরিকার হাত থেকে পূজার উপকরণ নিয়ে তাকে অন্দরে পাঠিয়ে দিতে, যাতে-যে উদয়নের নজরে না পড়ে। পরিচারিকা তাকে গিয়ে বলল, সারিকা মেধাবিনীকে ফেলে কেন সে এখানে এসেছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যাক। মেধাবিনীকে সাগরিকা সুসঙ্গতার হাতে

রেখে এসেছে, তাই সিন্ধুবার গাছের আড়াল থেকে মদনপূজা দেখার জন্য কৌতূহলবশে রয়ে গেল। বাসবদত্তা তখন উদয়নকে স্বাগত জানাল, উদয়ন নতুন করে শৃঙ্গাররসের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বাসবদত্তাকে অভিনন্দিত করল। তারপর বাসবদত্তা প্রথমে মদনকে অর্চনা করে পরে বিশেষভাবে স্বামীকে অর্চনা করল। আড়াল থেকে সাগরিকা উদয়নকে মদন ভেবে পরম আনন্দলাভের অভিব্যক্তি করল। কিন্তু উদয়ন শৃঙ্গাররসের আধিক্যে আকুল হয়ে উঠলে নেপথ্যে বৈতালিক (নগ্নাচার্য) তার-মধুর স্বরে 'স্ফুটার্থ' পাঠ করল। তাতে সন্ধ্যাবর্ণনার সঙ্গে উদয়নের নাম শুনে সাগরিকার ভ্রম ঘুচল। তখন তার চোখেমুখে বিস্ময় আর 'রতি'র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। এই সেই উদয়ন যার সঙ্গে বিবাহের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল; তাহলে তার দাসত্ব বৃথা হয় নি—এই বলে, কোনো মতে নায়কের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে মঞ্চ ছেড়ে চলে গেল। বসন্তক ও বাসবদত্তাকে শ্লোক শোনাবার পর বিচিত্র ভঙ্গিতে পা ফেলে ('চিত্রচরণ-ন্যাসে') 'নিষ্ক্রমণ-ধ্রুবা'র তালে সকলের সঙ্গে উদয়ন প্রস্থান করল।

দামোদরগুপ্তের বিবরণ অসম্পূর্ণ। কিন্তু 'রত্নাবলী' নাটকখানি এই বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই অভিনয়ের মোটামুটি রূপটি পরিষ্কার হবে। এই বিবরণে 'পূর্বরঙ্গে'র এমনকি 'নান্দী'রও কোনো উল্লেখ নেই। অভিনয়ের আগে 'পূর্বরঙ্গ' যে আবশ্যিক কৃত্য, তা সেকালে সকলেরই জানা ছিল। তাই বাহুল্যভয়ে সম্ভবত দামোদরগুপ্ত তার উল্লেখ না করে একেবারে নাটকের লিখিত অংশ 'প্রস্তাবনা' থেকেই বর্ণনা করেছেন। প্রস্তাবনাতে 'স্থাপকে'রও উল্লেখ নেই। 'স্থাপক' ও সূত্রধারের ভেদ নিশ্চয়ই অষ্টম শতাব্দীর আগেই লোপ পেয়েছিল।

পাঠককে ধরে নিতে হবে, সূত্রধারের প্রবেশের আগেই মঞ্চের সামনের 'যবনিকা' উঠেছে, সেই 'যবনিকা' গোটা অঙ্কের মধ্যে একবারও পড়ে নি। মঞ্চ থেকে সবাই প্রস্থান করলে অঙ্কশেষ বোঝাতে আবার 'যবনিকা' পড়েছে। অবশ্য অঙ্কশেষে যবনিকাপাতের পক্ষেও খুব জোরালো—অন্তত দামোদরগুপ্তের আমলের কোনো প্রমাণ নেই, শুধু সম্ভাব্য অনুমান মাত্র।

সূত্রধারের কথার সূত্র ধরে যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ থেকে অঙ্ক শুরু। কিন্তু তার প্রস্থানের সঙ্গেই একটি ছোট দৃশ্য শেষ হলো ধরে নিতে হবে। এটি একটি 'বিষ্কম্ভক'। সেই রকম এই অঙ্কে আরও দুটি পৃথক পৃথক দৃশ্য আছে এবং দৃশ্যগুলির 'স্থান'ও পৃথক পৃথক। যৌগন্ধরায়ণ যে 'স্থানে' কথা বলছে তা রাজপ্রাসাদের নিচের কোনো স্থান, যেখান থেকে সামনেই উৎসবমত্ত পুরবাসীদের চোখে পড়ে, তাদের নাচগানের সোরগোল কানে আসে, আর সেখান থেকেই প্রাসাদের চূড়া দেখা যায়; উদয়ন-বসন্তকের কথোপকথন ও চেটীদের সংবাদ জানানো পর্যন্ত দৃশ্যটির 'স্থান' প্রাসাদচূড়া। তারপর গোটা দৃশ্যের 'স্থান' মকরন্দোদ্যান। দামোদর-গুপ্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণে চেটীদের প্রস্থানের পরই বাসবদত্তার প্রবেশ। প্রাসাদচূড়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে মকরন্দোদ্যানের উল্লেখে মনে হতে পারে, সংস্কৃত নাটকে 'স্থানে'র ঐক্যের একেবারেই অভাব। এক্ষেত্রে মূল 'রত্নাবলী' মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

মূলে আছে, 'বিষ্কম্ভকে'র পর উদয়ন ও বসন্তকের কথাবার্তা হলো; চেটীরা সংবাদ জানিয়ে চলে গেলে দুজনে প্রাসাদচূড়া থেকে নিচে নামল; তারপর বসন্তক রাজাকে মকরন্দোদ্যানের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর পরিচারিকার সঙ্গে বাসবদত্তা প্রবেশ করল। সংস্কৃত নাটকের অভিনব পদ্ধতি মনে রাখলে এখানে 'স্থানে'র ঐক্য শিথিল বলে মনে হবে না

প্রাসাদচূড়া থেকে উদয়ন বসন্তককে বলল, "চল আমরা নামি।" তখন তারা নিচে নামার অভিনয় করল ("প্রাসাদাবতরং নাটয়তঃ")। সে অভিনয় কেমন হবে তা নাট্যশাস্ত্রে নির্দেশ করা হয়েছে। আর দর্শকেরও তা জানা। নিচে নামার পর উদয়ন উদ্যানের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বললে—বসন্তক আগে উদয়ন পিছনে এমনিভাবে—মঞ্চের উপর কিছুক্ষণ 'পরিক্রমণ' করার পর বসন্তক বলল, "এই সেই মকরন্দোদ্যান, চলুন ভিতরে যাই।" প্রাসাদ থেকে উদ্যানের দূরত্ব কতটুকু তা বুঝতে হবে মঞ্চের উপর কতক্ষণ 'পরিক্রমণ' করা হলো তাই দিয়ে। এই 'পরিক্রমণে'র নিয়মকানুন নাট্যশাস্ত্রের 'কক্ষাবিভাগ' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এরপর উদয়ন ও বসন্তকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে উদ্যানের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ যেন অনেকটা আধুনিক চলচ্চিত্রের কায়দায় উদয়ন ও বসন্তককে প্রাসাদ-চূড়া থেকে ক্যামেরায় অনুসরণ করে বিনা ছেদে একেবারে উদ্যান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে 'স্থানে'র ঐক্য বজায় রাখা। তারপর বাসবদত্তার প্রবেশ। এখান থেকে অঙ্কের শেষ পর্যন্ত উদ্যানই ঘটনার 'স্থান'।

এক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য, 'বিষ্কম্ভক'কে পৃথক করে নিলে গোটা অঙ্কের মধ্যে 'স্থানে'র ঐক্য আরও সহজে বজায় থাকে। 'বিষ্কম্ভক'-তো পৃথক দৃশ্যই। 'বিষ্কম্ভকে'র পর একবার মাত্র 'যবনিকাপাত' কল্পনা করলে ব্যাপারটি একেবারেই সহজ হয়ে যায়। অবশ্য এখানে 'যবনিকাপাতে'র কোনো নজিরই নেই। কিন্তু নাটকের নির্দেশ আছে, যৌগন্ধরায়ণের প্রস্থানের পর অর্থাৎ 'বিষ্কম্ভক' শেষ হবার পর, 'আসনস্থ' রাজার প্রবেশ। মঞ্চে আসন ব্যবহারের বিধি আছে। কিন্তু 'আসনস্থ' রাজার প্রবেশ কল্পনা করা কষ্টকর। একমাত্র 'যবনিকা' ওঠার পরই মঞ্চেও 'আসনস্থ' রাজার প্রবেশ কল্পনা করা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে 'প্রবেশ' কথাটিকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হয়। এই ধরনের কল্পিত মঞ্চনির্দেশ 'রত্নাবলী'র তৃতীয় অঙ্কের পক্ষেও প্রযোজ্য।

প্রাসাদচূড়া থেকে উদ্যানে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশটির 'স্থানে'র ঐক্য রেখে দেখাতে আধুনিক মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে অন্তত তিনটি পৃথক দৃশ্যের প্রয়োজন, তাও অবশ্য দৃশ্যপটের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু প্রাচীন অভিনয়ের বিশিষ্ট 'নাট্যধর্মী' পদ্ধতিতেই 'রত্নাবলী'র প্রথম অঙ্কে ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব। অবশ্য 'রত্নাবলী'র মতো সংস্কৃত নাটকে সর্বত্রই যে এই ধরনের ঐক্য বজায় রাখা যায় তা ঠিক নয়। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের অঙ্কগুলি বিচার করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। আধুনিক অর্থে সংস্কৃত নাটকে স্থানের ঐক্য অপেক্ষাকৃত শিথিল একথা মানলেও, পীলের (Peele) নাটকের মতো (একই অঙ্কে নটি বিভিন্ন স্থান) অতখানি অনৈক্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

এখানে মনে রাখতে হবে, বাসবদত্তার প্রবেশ থেকে পূজারম্ভ পর্যন্ত অংশটি উদয়ন ও বসন্তকের চোখের সামনে ঘটে নি, যদিও মঞ্চের একাংশে তারা উপস্থিত। তা ছাড়া, সাগরিকাও দাঁড়িয়ে আছে সকলের অগোচরে। বাসবদত্তা পূজা শুরু করার আগে উদয়ন ও বসন্তককে দেখতে পায় নি, আর সাগরিকা সবাইকে দেখতে পেলেও তাকে কেউ দেখতে পায় নি। মাঝারি মঞ্চের উপর এতগুলি পাত্র-পাত্রী উপস্থিত, অথচ বেশ কিছুক্ষণ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, আড়াল দেবার মত কোনো কিছুই মঞ্চে নেই, সকলের চোখের সামনে দাঁড়িয়েও সাগরিকা লক্ষ্যগোচর নয়, এ হেন দৃশ্যে আধুনিক দর্শক বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু প্রাচীন দর্শকেরা হতো না। কারণ, অভিনয়ের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি মৌলিক নিয়ম ছিল, যা দিয়ে বোঝানো হতো কে কাকে দেখতে পাচ্ছে বা পেয়েছে, কে সকলের দৃষ্টির আড়ালে আছে, একই মঞ্চে উপস্থিত থেকেও কারা ঘরের ভিতরে বা বাইরে রয়েছে। প্রাচীন দর্শকরা এই নিয়মগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিল। তাই চোখে দেখা সত্ত্বেও নাট্যরস উপলব্ধিতে তাদের কোনো বাধা ঘটতো না।

দামোদরগুপ্ত চেটীদের অংশটির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বং

করেছেন। নাটকের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যোগ রেখে নৃত্যপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে এটি অত্যন্ত মূল্যবান। মূল 'রত্নাবলী'তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "তখন মদনলীলার অভিনয় করতে করতে ও দ্বিপদী গানের একপদ গাইতে গাইতে দুই চেটীর প্রবেশ (মদনলীলাং নাটয়ন্তৌ দ্বিপদীখণ্ডং গায়ন্তৌ)"। কিন্তু মদনলীলার ক্ষেত্রে প্রবেশ ও প্রস্থানসমেত 'আঙ্গিক' অভিনয়—হাত, পা, মুখ, চোখ প্রভৃতি 'অঙ্গ' ও 'উপাঙ্গে'র অভিনয়—কেমন হবে, দামোদরগুপ্তের বিবরণে তা পরিষ্কার। তা ছাড়া, বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সময়োচিত 'আঙ্গিক' ও 'সাত্ত্বিক' অভিব্যক্তিগুলি নাচের সঙ্গে মিলিয়ে কল্পনা করলে নাটক অভিনয়ের প্রাচীন রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'আঙ্গিক অভিনয়' ছাড়াও 'রত্নাবলী'র এই অভিনয়ে 'বাচিক' ও 'আহার্য অভিনয়' কেমন হয়েছিল দামোদরগুপ্ত তাও বর্ণনা করেছেন। অভিনয়ের শেষে সমরভট্ট সকলের সামনে অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'গীত ও বাদ্য-প্রয়োগের' প্রশংসা করে বলেছে, ভূমিকা অনুযায়ী পাত্রপাত্রীর পাঠে উচ্চারণের যথাযথ 'স্থান' (বক্ষ, কণ্ঠ ও শিরঃ—যা থেকে মন্দ্র, উদার ও তার স্বরের উদ্ভব) রক্ষিত হয়েছে, রস ও 'কাকু'তে ব্যঞ্জিত হওয়ার অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে এবং 'পাঠ' মনোরম, 'অবিশ্রান্ত' (fluent), 'নিরবদ্য' ও অখিল-ভাবযুক্ত হয়েছে।...নটনটী প্রকৃতি ও বিশেষ অবস্থা বোঝাবার মতো যে সাজসজ্জা করেছে তা অনুকরণ করা কঠিন। বলাবাহুল্য, বিভিন্ন অভিনয়ের এ বর্ণনার সমস্তই নাট্যশাস্ত্রের অনুমোদিত।

'রত্নাবলী'তে মেধাবিনী নামে সারিকার (টিয়া, ময়না বা শালিখ) গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। মেধাবিনী খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে সাগরিকা ও সুসঙ্গতার কথাগুলি আওড়াবে, উদয়ন ও বসন্তক তা শুনে সাগরিকার অনুরাগ সম্পর্কে অবহিত হবে। দামোদরগুপ্ত দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় বর্ণনা করলে জানা যেতো খাঁচার মধ্যে নকল (পুস্ত) না জীবন্ত (সজীব), কোন ধরনের পাখি ব্যবহার করা হতো।

মূলে আছে, 'সারিকাপঞ্জর' হাতে সুসঙ্গতার প্রবেশ। খাঁচায় নকল পাখি দিয়েও কাজ চলতে পারে। কিন্তু পাখি উড়ে যাবার দৃশ্যে জীবন্ত পাখি দেখাতে পারলে যে চমৎকার হয়, তা বলাই বাহুল্য। বুলি-না-জানা পাখি হলেও যে কাজ চলতে পারে তা মূল নাটক পড়লেই বোঝা যাবে। মঞ্চে জীবন্ত পাখি অথবা প্রাণী হাজির করার বিধি নাট্যশাস্ত্রে আছে। সুতরাং 'রত্নাবলী'তে সম্ভব হলে নকলের বদলে আসল পাখিই যে হাজির করা হতো, এ অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়।

অনুকরণবাদ : গ্রীক ও ভারতীয়

কাব্য-শিল্পে অনুকরণবাদ অতি প্রাচীন—সম্ভবত প্রাচীনতম মতবাদ। এবং তা স্বাভাবিকও বটে। অনুরূপ-নির্মিতির (making alike) ক্ষমতার মধ্যেই মানুষের সভ্যতার জয়যাত্রার রহস্য। এই ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছে বস্তুর উপরে আধিপত্য। মূল্যহীন, আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় পাথরের টুকরো দিয়ে 'অনুরূপ' অস্ত্র-নির্মাণ বা সদৃশকরণ ব্যাপারের মধ্যে মানুষ এক গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল; মানুষ দেখেছিল, সদৃশকরণের সাহায্যেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন, কোনো জন্তুর অবয়ব, ভঙ্গি, স্বর ইত্যাদির অনুকরণ করলে তাকে আকৃষ্ট বা আয়ত্ত করা যায়। এরই নাম জাদু (magic)। এই উদ্দেশ্যেই মানুষের অঙ্গ, কণ্ঠ, বাক্য এবং বাহ্যিক রঙ, রেখা, শব্দ ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে সভ্যতার প্রত্যুষ থেকেই সদৃশকরণ বা অনুকরণের এত আয়োজন। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বস্তু-জগতের সাদৃশ্য আবিষ্কার থেকেই ক্রমশ অগ্রসর হয়ে মানুষ ভাব-জগতের অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছে।

জাদুর সঙ্গে অনুকরণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং আর্ট বা শিল্প মূলত জাদুর অঙ্গ। কিন্তু জাদুর অঙ্গীভূত অনুকরণ—যা আদিম আর্ট—তার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে সৌন্দর্যের বা সৌন্দর্যবোধের কোনো সম্পর্কই ছিল না, তা ছিল সম্পূর্ণ প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় মাত্র। সভ্যতার অগ্রগতির ধাপে ধাপে বিজ্ঞান, ধর্ম ও আর্ট একটু একটু করে পৃথক হয়েছে। এই জন্য আর্টের তথা কাব্য-শিল্পের ইতিহাসে

কারু ও চারুশিল্প, ধর্ম ও কাব্য জন্মসূত্রেই পরস্পর সম্পর্কিত। ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশুদ্ধ কাব্যশিল্পের বিবর্তন যেমন সময় সাপেক্ষ, তেমনি সময় সাপেক্ষ তার স্বরূপটি অনুধাবন করা। বিবর্তনের ইতিহাসের মতোই এই স্বরূপ অনুধাবনের ইতিহাসেরও ধারাবাহিকতা আছে। অনুকরণ থেকে সূত্রপাত বলেই কাব্য-শিল্পের স্বরূপ যে অনুকরণ লক্ষণেই প্রথম পর্যায়ে গৃহীত হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাছাড়া, বস্তু ও তার শিল্পরূপের মধ্যে যে বাহ্য সাদৃশ্য, তা থেকে আপাতদৃষ্টিতে অনুকরণের ধারণাই দৃঢ় হয়; এবং তারই ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকরণকে কেন্দ্র করেই যে শিল্পদর্শনের আলোচনা স্বরু হবে এটিও স্বাভাবিক। প্রাচীন গ্রীসে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল।

গ্রীসের প্লেটোর নন্দনতত্ত্বের মূল কথাই ছিল অনুকরণ (mimesis)। কাব্য-শিল্পের ক্ষেত্রে অনুকরণ শব্দটির প্রয়োগ গ্রীক সাহিত্যে প্লেটোই প্রথম করেছেন। তবে সম্ভবত তাঁর আগে সাধারণ কথাবার্তায় কারু ও চারুশিল্পের পার্থক্য বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হতো।[১]

প্লেটো তাঁর আদর্শ রাজ্য থেকে কবি-শিল্পীদের নির্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন; কাব্য-কবিতার প্রতি তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। কবি প্লেটোর সঙ্গে দার্শনিক প্লেটো কোনো আপোস করেন নি। যে-মানুষের জীবনের মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, প্লেটোর মতে, সে অন্য কোনো রকম ভূমিকার অনুকরণ করতে পারে না। যারা করে, তারা নিম্ন স্তরের মানুষ।[২]

প্লেটোর মতে শিল্প-সাহিত্য মূলত অনুকরণ। শিল্পীর শিল্প বা কবির কাব্য বস্তু বা জীবনের অনুকরণ বা প্রতিরূপণ। এই অনুকরণ দর্শক বা শ্রোতার অনুভূতিকে জাগ্রত করে, তাকে হাসায় কাঁদায়, আবেগে মথিত করে এবং তাকে অনুকরণরূপেই আনন্দ দান করে। এই জাগ্রত অনুভূতি তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপরে, বাস্তব জীবনেই

তার ভাবগত আচরণের ক্ষেত্রে, প্রভাব বিস্তার করে। আর এই জন্যই, তাঁর মতে, শিল্প-সাহিত্য ক্ষতিকারক—যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনই সমাজের ক্ষেত্রে। প্লেটো ছিলেন নির্মম বুদ্ধিবাদী। মানুষের মনের যে তিনটি বিভাগ তিনি নির্দেশ করেছেন, তিনি বলেন, তার সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাসনাংশকে কাব্য-শিল্প পুষ্ট করে—যা কখনোই কাম্য হতে পারে না। কবি-শিল্পীরা শক্তিমান সন্দেহ নাই, তাঁরা শ্রদ্ধার্হও বটেন, কিন্তু আদর্শ রাজ্যে তাঁদের স্থান হতে পারে না।

প্লেটো বলেন, কবি বা শিল্পীরা পৃথক পৃথক মাধ্যমে যা অনুকরণ করেন তা মূলের তথা বাস্তবের সদৃশ হয় না। রঙ্-তুলি বা শব্দ-অর্থে যা অনুকৃত হয় তা মূলের অনু-রূপতা লাভ করতে পারে, কিন্তু তাতে মূলের যথার্থ-রূপতা নেই। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর বিখ্যাত তুলনাটি স্মরণীয়।[৩] অনুকৃতে অনুকার্যের সমগ্রতা থাকতে পারে না। এইজন্য অনুকার্য বাস্তব থেকে অনুকৃত কাব্যশিল্প অবশ্যই নিকৃষ্ট। প্লেটো ভিন্নতার মধ্যেও সমস্ত শিল্পের সাজাত্য আবিষ্কার করেছিলেন। চিত্রকার ও কাব্যকার একই গোত্রের, তাদের উপকরণ ও মাধ্যম স্বতন্ত্র হতে পারে কিন্তু তাদের কাজ একই—বস্তুর অনুকরণ।

আরিস্ততল গুরুর অনুকরণ তত্ত্বকে মূলত স্বীকার করে নিলেও তার উপসংহারকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, কাব্য-শিল্প অনুকরণ বলেই তা বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট এবং কাব্য-শিল্পের মাধ্যমে জাগ্রত অনুভূতির ক্ষতিকারক নয়।

আরিস্ততলের মতে অনুকরণই সমস্ত শিল্পের সামান্য লক্ষণ। কাব্য ও অ-কাব্যের প্রভেদ বুঝতে হবে অনুকরণের মাপকাঠিতে। এম্পেদোক্লেস ছন্দে পদার্থবিদ্যা লিখলেও তা কাব্য নয়, আবার সোফোরন ও জেনার্কস প্রহসন (mime) গদ্যে লিখলেও তা অ-কাব্য নয়। আগের ক্ষেত্রে অনুকরণের প্রশ্নই ওঠে না, পরের ক্ষেত্রে ছন্দোহীনতা সত্ত্বেও অনুকরণই মুখ্য।

প্লেটো সমস্ত শিল্পের সাজাত্য স্বীকার করলেও আরিস্ততলই

ব্যাপারটিকে বিশদ করেছেন। তাঁর মতে, নাটকসহ সকল প্রকার কাব্য, সংগীত, চিত্র অনুকরণাত্মক ; প্রভেদ কেবল বিষয় (object), মাধ্যম (means) এবং প্রণালী (manner)-র।[৪] অনুকরণ মানুষের স্বভাব, অনুকরণের প্রবৃত্তিই পশু থেকে মানুষকে পৃথক করেছে আর অনুকৃত বস্তু মাত্রেই আনন্দদায়ক।[৪]

অনুকরণ বলতে যথার্থ কি বোঝায় তা প্লেটো স্পষ্ট করেন নি, আরিস্ততলও করেন নি। শব্দটির বিভিন্ন প্রয়োগ থেকে তার অর্থবিস্তারটি অনুধাবন করতে হয়। আরিস্ততল ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পকে বলেছেন, প্রকৃতির পরিপূরক ;[৫] ক্ষেত্র বিশেষে বলেছেন, শিল্প হচ্ছে প্রকৃতির সমান্তরাল। এবং উভয় ক্ষেত্রেই শিল্প বলতে কারু-শিল্পকেই বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে তিনি অনুকরণ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতির অনু-রূপণ বা প্রতিবিম্বন (image)। প্রকৃতি বলতেও তিনি নিছক বাহ্য বস্তু-জগৎকে বোঝান নি। চিত্রের প্রসঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োগে মনে হয় যেন সংকীর্ণ অর্থে স্থূল অনুকরণের কথাই বলা হচ্ছে ; কিন্তু তিনিই আবার বলেছেন নৃত্য ও সংগীত অনুকরণের ভেদ মাত্র। সংগীতকে তিনি শ্রেষ্ঠ অনুকরণ বলেছেন। আরও স্পষ্ট করে বলেছেন ট্রাজিডি প্রসঙ্গে : "ট্র্যাজেডি···হচ্ছে কোনো এক ক্রিয়ার (action) অনুকরণ··· ; অথবা, ট্রাজিডি ব্যক্তির অনুকরণ নয়, আসলে তা হচ্ছে ক্রিয়া (action) ও জীবন, সুখ ও দুঃখের অনুকরণ···"[৬] ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলতে, কাব্যের অনুকরণ হচ্ছে মানস অনুকরণ।

অনুকরণের বিষয় বা বস্তু হিসাবে আরিস্ততল মানুষের চরিত্র, প্রবৃত্তি, কাজের উপরেই জোর দিয়েছেন বেশি। তাঁর মতে অনুকৃত মানুষ কেবলমাত্র বাস্তবানুগ হবে না, বাস্তব থেকে উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্টও হবে।[৭] সর্বোপরি অনুকৃত বস্তু হবে ঘটে' যাওয়া কোনো কিছু নয়, এমন কিছু, যা ঘটা সম্ভব ; কোনো বিশেষ বস্তু নয়,

সাধারণ অথবা সর্বজনীন (universal) বস্তু। এই জন্যই ছন্দে গাঁথলেও হেরোদোতাসের রচনা ইতিহাসই, কাব্য নয়।[৮]

অনুকরণ সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা ছিল স্থূল। অনুকরণ বলতে তিনি mimicry-কে বুঝেছিলেন, তাই তাঁর কাছে স্বভাবতই অনুকরণ ব্যাপারটা বাস্তবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অর্থহীন চেষ্টা বলে মনে হয়েছিল। তাঁর কাছে ভাব বা তত্ত্বও অনুকরণ। তাঁর মত তাঁর আইডিয়া-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আরিস্ততলের মতের ভিত্তি মাধ্যমের (medium) ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিল্পে অনুরূপতা থাকলেও তা স্বতন্ত্র বস্তু, তা কখনোই প্রতি-রূপ নয়, আর তাই শিল্প বাস্তবের সঙ্গে অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বও নয়।[৯]

আরিস্ততলের অনুকরণ-তত্ত্ব মূলত সাহিত্য-শিল্পের স্বরূপ বিচারের সামগ্রিক তত্ত্ব। তিনিই প্রথম কারু ও চারুশিল্পের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কাব্য-শিল্পের প্রয়োজন যে ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদির প্রয়োজনবোধ থেকে স্বতন্ত্র, তা তাঁর কাছেই সর্বপ্রথম ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, বিশেষের মধ্যে সামান্যের প্রকাশ—কাব্য-শিল্পের এই যে মৌল লক্ষণ—তা তিনিই প্রথম স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন। তিনি কাব্য-শিল্পের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন তা নিয়ে দু'হাজার বছরেরও বেশি আলোচনা হয়ে আসছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত মূলত তাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁর মনীষার মতোই তাঁর অনুকরণ-তত্ত্ব প্রকৃত ক্লাসিক তত্ত্ব।

গ্রীসের মতো অতখানি না হলেও, অনুকরণ-বাদ ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। অবশ্য ভারতীয় অনুকরণ-বাদ কেবলমাত্র নাট্যের ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে; এবং শক্তিমান প্রতিপক্ষের যুক্তিতে খণ্ডিত হওয়ায় তা গ্রীসের মতো কাব্য-শিল্পের সমগ্র ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হওয়ার অবকাশ পায় নি।

ভারতীয় নাট্য তথা কাব্য-তত্ত্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ - ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্য বা অভিনয়কে 'অনুকৃতি' বলা হয়েছে ; বলা হয়েছে, নাট্য হচ্ছে "লোকবৃত্ত ও সপ্তদ্বীপের অনুকরণ," ইত্যাদি।[১০] কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে প্রযুক্ত 'অনুকরণ' শব্দের অভিপ্রেত অর্থটি নির্ণয় করা কঠিন। সঙ্কীর্ণ অথবা ব্যাপক কোন অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা নাট্যশাস্ত্রের আভ্যন্তর প্রমাণে সিদ্ধ করা দুষ্কর। আর সেই জন্যই নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন টীকাকারের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে উপায় নেই।

এমন একজন ব্যাখ্যাকার হচ্ছেন শঙ্কুক। তিনিই ভারতীয় অনুকরণ-বাদের প্রবক্তা। তাঁকেই রসতত্ত্বের বিতর্কে অনুমিতি পক্ষ বলা হয়। শঙ্কুক বলেন : নাট্যের যে রস তা হচ্ছে রাম অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর অনুকৃত চিত্তবৃত্তি। পাত্রপাত্রীর চিত্তবৃত্তি অনুকৃত হয় বলেই তা আস্বাদ্য অর্থাৎ আনন্দদায়ক।[১১] এই চিত্তবৃত্তি দর্শকের কাছে অনুভবের বস্তু বা প্রতীতিযোগ্য ক'রে তোলা চাই ; সেই-জন্য অভিনয়ের প্রয়োজন, তার অর্থ, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী ভাবের উপস্থাপন। 'অভিনয়' বলতে শঙ্কুক প্রতীতি ঘটানোর ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। আর এই ব্যাপারের নামই 'অনুকরণ'। তাঁর মতে, নাট্য তথা রসের স্বরূপই হচ্ছে অনুকরণ। শঙ্কুকের এই 'অনুকরণ' কিন্তু কোনো মতেই আভিধানিক অর্থে অনুকরণ নয়। মম্মভট্টের কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে এবং পরবর্তী কালের আলোচনায় তাঁর মতের এই দিকটি স্পষ্ট হয় নি।

শঙ্কুকের অনুকরণ-তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন অভিনবগুপ্তের উপাধ্যায় ভট্ট তোত।[১২] তিনি প্রথমেই এই যুক্তি উত্থাপন করেছেন : রস যে অনুকরণ নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে দর্শকের প্রতীতিতে অনুকৃতির কোনো বোধ থাকে না ; অর্থাৎ দর্শকের এমন মনে হয় না যে, সে কোনো কিছুর বা কোনো চিত্তবৃত্তির অনুকরণ দেখছে। তাছাড়া, দর্শকের অনুকৃতির বোধের ক্ষেত্রে অনুকার্য এবং অনুকৃত

উভয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। অনুকরণ মানলে অনুকার্য অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর নিজস্ব চিত্তবৃত্তির জ্ঞান দর্শকের আছে বলে ধরে নিতে হয়—যা এক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব। "মুখ্য ও অমুখ্য দু'টিকে বোঝার পরই, এ যে ওর অনুকরণ, তা ধরা পড়ে।"[১৩] তাঁর দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে এই : অভিনেতারও এমন মনে হয় না যে সে কোনো কিছু বা ভাবের অনুকরণ করছে। বেশভূষায় সজ্জিত অভিনেতা কোনো ভাবেরই অনুকরণ করে না ; সে কতকগুলি আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক উপকরণের সাহায্যে অভিনয় ব্যাপারটি নিষ্পন্ন করে মাত্র। তার বোধ সীমাবদ্ধ থাকে শুধু এইগুলির মধ্যেই। তাই কোনো দিক থেকেই অনুকরণ সিদ্ধ হয় না। ভট্ট তোত তথা অভিনবগুপ্তের মতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অনুকরণবাদের কোনো সমর্থন নেই।[১৪]

শঙ্কুক বলেছেন : নাট্যে যে বস্তুর জ্ঞান হয় তা চতুর্বিধ লৌকিক পরামর্শজ্ঞান থেকে একটি পৃথক জ্ঞান।[১৫] তার অর্থ দাঁড়ায়, নাট্যে যে জ্ঞানই থাক, অনুকরণের জ্ঞানটি সেখানে অনুপস্থিত। অনুকরণের দিক থেকে শঙ্কুক নাট্য ও চিত্রকে একই পর্যায়ে ফেলেছেন।[১৫] কিন্তু ভট্ট তোত এবং অভিনবগুপ্ত তা মানেন না। তাঁরা বলতে চান, চিত্রদর্শনে অনুকরণের বোধটি থাকে ; আঁকা-ঘোড়ার ছবি দেখলে দর্শকের এই বোধ হয় যে এটি বাস্তবের অর্থাৎ প্রকৃত ঘোড়ার অনুকৃতি কিন্তু নাট্যে তা হয় না।[১৬]

নাট্য যদি অনুকৃতি না হয়, তাহলে তা কি ? অভিনবগুপ্ত এই তত্ত্ব নির্ধারণ করেছেন নাট্যশাস্ত্রের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। ভরত বলেছেন : "নাট্য কেবলমাত্র দেবতা বা দৈত্যদের অনুভাবন (representation) নয়, তা হচ্ছে ত্রিভুবনের সমস্ত কিছুর অনুকীর্তন।"[১৭] এই 'অনুকীর্তন' শব্দের ব্যাখ্যা নাট্যশাস্ত্রে নেই। 'অনুকীর্তন-কে কেউ কেউ অনুকরণের সমার্থক বলেও মনে করেছিলেন। অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যায় 'অনুকীর্তনের' সহজ অর্থ হচ্ছে : বিশেষ-সম্বন্ধরহিত বস্তুর সাধারণীকৃত রূপে প্রয়োগ ও গ্রহণ।

কিন্তু দর্শকের কাছে এই রূপটি হচ্ছে "প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎকারকল্প"। এবং এই রূপেই বস্তুর সঙ্গে দর্শক তাদাত্ম্য স্থাপন করে।

অভিনবগুপ্ত বলেছেন, এই 'অনুকীর্তন' হচ্ছে এক ধরনের অনুব্যবসায়, একে অনুকরণ বলে যেন ভুল করা না হয়। কারুর বা কোনো কিছুর অনুকরণ করা হচ্ছে, নাট্যে এমন কোনো বোধ থাকে না। অনুকরণের বোধ থেকে জন্মায় হাস্য। কারণ, অনুকরণ হলেই তাতে বিকৃতি ঘটে; আর সে হাস্যও নিম্নশ্রেণীর উপহাস জাতীয়, তাতে তাদাত্ম্য ঘটার কোনো অবকাশই নেই। তাই তা থেকে দর্শকের মনে জাগে ক্রোধ, ঈর্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন লৌকিক ভাব। কিন্তু নাট্যে এমনটি হতে পারে না।

অনুকরণকে যদি সদৃশ করণ বা ক্রিয়া বলা হয়, তাহলেও রাম ইত্যাদির ক্রিয়ার কোনো অনুকরণ সম্ভব নয়, কারণ, রামের কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে কেউ কখনো পরিচিত নয়। রামের মতো চরিত্রেরই যখন কোনো ক্রিয়ার অনুকরণ সম্ভব নয়, তখন কল্পিত চরিত্রের ক্রিয়ার অনুকরণ তো একেবারেই অসম্ভব।

চিত্তবৃত্তিরও অনুকরণ করা যায় না। নাট্যে যে শোকের অভিনয় হয় তাতে অভিনেতা নিজের শোককে রামের শোকের অনুরূপ করে তোলে না; কারণ, শোকের এই অভিনয় অভিনেতার নিজের শোকের কোনো স্থান নেই, যদি অভিনেতার শোকের কোনো স্থান থাকে, তাহলে তা বাস্তব শোকই হবে, অনুকরণ হবে না। আসলে, শোকের অভিনয়ে, শোক জাগলে যে সব বিকার ঘটে (যেমন, দীর্ঘনিঃশ্বাস, অশ্রুপাত ইত্যাদি), নট সেই অনুভাবগুলিই দেখায় মাত্র। কিন্তু ওই অনুভাবগুলি অভিনেয় পাত্রপাত্রীর অনুভাবের সদৃশ নয়, সজাতীয়। সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে বস্তু দুইটি বিশেষ হওয়া চাই এবং একই কালে বিদ্যমান থাকা চাই। অভিনয়ে পাত্রপাত্রীর শোক যখন অনুপস্থিত তখন তার সাদৃশ্য হতে পারে না; কিন্তু তার সাজাত্য হতে পারে। সাজাত্য হচ্ছে অনেক পদার্থে সমবেত নিত্য

ধর্ম। শোকের অনুভাবগুলি সজাতীয়, সুতরাং সাধারণরূপে দেখা দেয়, অনুকরণরূপে নয়। ভিন্নকালীন বিশেষ বস্তুর যদিবা ক্বচিৎ কখনো অনুকরণ সম্ভব হয়,[১৮] সামান্য বস্তুর ক্ষেত্রে অনুকরণ তো একেবারে অসম্ভব, তার ক্ষেত্রে অনুকরণের প্রশ্নই ওঠে না।[১৯] তাই নাট্য কখনোই অনুকরণ নয়। এ সত্ত্বেও নাট্যকে যদি অনুকরণ বলতেই হয়, তাহলে তা বলতে হবে গৌণ অর্থে, মুখ্যার্থে কখনোই নয়। নাট্যে লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ করা হয়, এই অর্থে কেউ যদি তাকে অনুকরণ বলে, তাতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই।[২০]

ভট্ট তোত ও অভিনবগুপ্ত নাট্যে অনুকরণবাদকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করেছেন এবং তার পরিবর্তে যে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন তা কেবল নাট্যে নয়, সমগ্র কাব্য-সাহিত্যে তথা সংগীত-নৃত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁদের মতে অনুকরণ নয়, ব্যঞ্জন বা ধ্বনন কাব্য-নাট্য-সংগীতের সামান্য লক্ষণ এবং বিষয় (object), মাধ্যম (means) ও প্রণালী (manner) ভেদেই এদের প্রকার ভেদ।

শঙ্কুকের অনুকরণবাদ নিঃসন্দেহে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, অনুকৃত চিত্তবৃত্তি—যাকে তিনি রসানুভূতি বলেছেন—তাঁর মতে তা হচ্ছে অনুমান, সুতরাং তা সবিকল্পক ; অথচ একই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে ওই অনুভূতি সমস্ত সবিকল্পক জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, শঙ্কুক যাকে অনুকরণ বলতে চেয়েছেন তার অর্থ সংকীর্ণ নয়। এবং এই অনুকরণ তত্ত্বকে নাট্য ছাড়াও স্বচ্ছন্দে সমগ্র কাব্য-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যেতে পারে। শঙ্কুকই বলেছেন যে, নিছক অভিধার্থ থেকে কোনো চিত্তবৃত্তির প্রতীতি হয় না। চিত্তবৃত্তিকে অভিনেয় করে তুলতে হয়, তার অর্থ, তার 'অনুকরণ' করতে হয়। 'অভিনয়ন' বলতে তিনি অভিধার অতিরিক্ত প্রতীতি ঘটানোর শক্তিকে বুঝেছেন।[২১] এই প্রসঙ্গে অভিনীত অর্থাৎ অনুকৃত রতির যে

দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন তা ব্যঞ্জিত রতির দৃষ্টান্তও বটে।[২২] আর এইজন্যই অভিনবগুপ্ত শঙ্কুকের মতের এই দিকটির সশ্রদ্ধ উল্লেখ না করে পারেন নি।[২৩]

প্রাচীন গ্রীক মন ও প্রাচীন ভারতীয় মনের গঠন স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন। কাব্য-শিল্পে গ্রীক দৃষ্টিতে প্রাধান্য পেয়েছে বস্তু, আর ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রাধান্য পেয়েছে ভাব। বস্তু-প্রাধান্যের জন্যই গ্রীক কাব্য-শিল্পের পদ্ধতি স্বভাবতই অনুকারক পদ্ধতি। কাব্য-শিল্পের স্বরূপ বোঝাতে অনুপযুক্ত হলেও 'অনুকরণ' শব্দটিকে আরিস্তত্‌ল পরিহার করতে পারেন নি, বাধ্য হয়ে তাঁকে অর্থব্যাপ্তি ঘটিয়ে নিতে হয়েছে। গ্রীক অনুকরণ বা mimesis শব্দটি কেবল গৌণার্থেই নয়, কার্যত নতুন অর্থেই প্রযুক্ত। কিন্তু ভাব-প্রাধান্যের দৃষ্টিতে দেখার জন্যই 'অনুকরণ' শব্দটি ভারতীয় কাব্য-তত্ত্বের ইতিহাসে অপ্রচলিত শব্দ হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে, যেমন বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে, কদাচিৎ যে 'অনুকরণ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাও সম্পূর্ণ গৌণার্থে।[২৪] কাব্যপদ্ধতি তো দূরের কথা, ভাবপ্রাধান্যে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিও প্রধানত ব্যঞ্জক পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। শিল্পাচার্য নন্দলাল সাধারণভাবে শিল্পের স্বরূপ সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্প সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য :

> "শিল্প হল সৃষ্টি। স্বভাবের অনুকরণ নয়। বাহ্য স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টির যে আবেগ নিরন্তর ক্রিয়াশীল শিল্পীর স্বভাবেও তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া; সুতরাং অনুকরণের কথা উঠে না।
>
> আলংকারিকদের ভাষায় বলতে গেলে, শিল্প ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। একটু রূপ, একটু রঙ্‌ ও একটু রেখা দিয়ে ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা বেদনায় অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলা তার কাজ।"[২৫]

পাদটীকা

১. এস্, এইচ্, বুচার—আরিস্টটলস্ থিওরি অফ্ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড ফাইন আর্ট, ২য় পরিঃ।

২. যেমন, প্লেটো বলেছেন (লজ্, ৮ম): বিদেশীরা ও দাসেরা আমাদের হয়ে কমেডি অভিনয় করবে।

৩. রিপাব্লিক, ১০ম।

৪. পোয়েটিক্স্, ১ পরিঃ; ৪ পরিঃ।

৫. "প্রকৃতি যেখানে অসম্পূর্ণ আর্ট সেখানে সম্পূর্ণতা দেয় অথবা আর্ট প্রকৃতির অসম্পূর্ণ অঙ্গগুলির অনুকরণ করে।"—ফিজিক্স্, ১ম।

৬. পোয়েটিক্স্, ৬ পরিঃ।

৭. পোয়েটিক্স্, ২ পরিঃ।

৮. পোয়েটিক্স্, ৯ পরিঃ।

৯. এইচ্, হাউস—আরিস্টটলস্ পোয়েটিক্স্, পৃঃ ১২৪।

১০. নাট্যশাস্ত্র, ১।৫৩, ১১২, ১১৩।

১১. "রস হচ্ছে মুখ্য রাম প্রভৃতির স্থায়ীর অনুকরণ হয়ে ওঠা স্থায়ী ভাব।"—অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য মৎকৃত, পৃঃ ৫০।

১২. ভট্ট তোতের যুক্তিগুলি উত্থাপন করেছেন অভিনবগুপ্ত তাঁর 'অভিনব ভারতী' গ্রন্থে। তোতের গ্রন্থের নাম 'কাব্যকৌতুক'। সেটি লুপ্ত। অনুকরণবাদের বিরুদ্ধে অভিনবগুপ্তের যুক্তি মূলত তাঁর গুরুরই যুক্তি। তিনি 'অভিনবভারতী'-র ১ম অধ্যায়ে বলেছেন: "অস্মদুপাধ্যায়কৃতে কাব্যকৌতুকেঽপ্যয়মেবাভিপ্রায়োঃ মন্তব্যঃ।"

১৩. "মুখ্যামুখ্যাবলোকনে চ তদনুকরণপ্রতিভাসঃ।"—অভিনবভারতী, ৬ অধ্যায়।

১৪. "স্থায়ীর অনুকরণ রস"—(ভরত) মুনির এই ধরনের কোনো উক্তিও কোথাও নেই। এই সম্পর্কে মুনির কোনো ইঙ্গিতও মেলে না। বরং, ...বিপরীত ইঙ্গিতই যে আছে...শেষে বিস্তারিত বলব।"—অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য, মৎকৃত, পৃঃ ৬৩-৬৪।

১৫. "বরং সম্যক্-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র আঁকা-ঘোড়া ইত্যাদির ছবি দেখলে যেমন হয় ঠিক তেমন ভাবেই —'যে রাম সুখী এই সে' এই রকম প্রতীতি হয়।"—ঐ, পৃঃ ৫২।

১৬. "সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে প্রদীপ ইত্যাদির মতো গরু অভিব্যঞ্জিত হয় না; কিন্তু তারই মতো একটি বিশেষ সমূহ রচিত হয়। এই ভাবেই, গরুর অবয়ব সন্নিবেশের মতো বিশিষ্ট সন্নিবেশরূপে বর্তমান সিঁদুর ইত্যাদি 'এটি গরুর মতো' এই প্রতীতির বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু এইভাবে বিভাব ইত্যাদির 'সমূহ' রতির মতো বলে প্রতীতিগোচর হয় না।"—ঐ পৃঃ ৬৪।

১৭. "নৈকান্ততোহত্র ভাবতাং দেবানাং চানুভাবনম্!
ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্॥"
অনুবাদে আমি 'ভাব' শব্দে 'পদার্থ' বা 'বস্তু' অর্থ গ্রহণ করেছি।

১৮. যেমন, কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের বাহ্যিক রূপ অথবা আচরণগত সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে।

১৯. "সামান্যকল্পে কোঽনুকারার্থঃ।"—অভিনবভারতী, ১ম অধ্যায়।

২০. "যদি ত্বেবং মুখ্যলৌকিককরণানুসারিতয়া অনুকরণমুচ্যতে তত্র কশ্চিদ্দোষ।"—অভিনবভারতী, ১ম অধ্যায়। "এটি অনুকরণও বটে কারণ, অনুভাবের অনুগামী করে তোলা হয়।"—অভিনবগুপ্তের, রসভাষ্য, পৃঃ ৮৫। গৌণার্থে 'অনুকরণ' শব্দের ব্যবহার পরবর্তী কালেও হয়েছে। 'দশরূপক' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যং'। 'অবলোক' বৃত্তিতে অবস্থার অনুকৃতি বলতে 'ধীরোদাত্তাদ্যবস্থানুকারঃ'। এই অনুকৃতি হয় চতুর্বিধ অভিনয়ের দ্বারা।
'দশরূপক'-এর অনুকৃতিকে Representation অর্থেও নেওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়। বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণ'-এ অভিনয়কেই বলেছেন 'অবস্থানুকারঃ', নাট্যকে নয়। রামচরণ তর্কবাগীশ বিবৃতি টীকায় 'অবস্থা'র অর্থ করেছেন 'সাধর্ম্য।' দশরূপক-কার অভিনবগুপ্ত এবং বিশ্বনাথ থেকে স্বতন্ত্র প্রস্থানবাদী, সুতরাং তাঁর পক্ষে 'অনুকৃতি' শব্দটির অপেক্ষাকৃত ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা অস্বাভাবিক নয়।

২১. "প্রতীতি ঘটানোর শক্তিই অভিনয় ক্রিয়া ; তা বাচ্য করে তোলার শক্তি থেকে পৃথক্।"—অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য, পৃঃ ৫১।

২২. "আঁকতে গিয়ে আমার গায়ে চোখের জলের কয়েকটা ফোঁটা পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন তার হাতের ছোঁয়ায় ঘাম ফুটে উঠেছে।" নায়িকা সাগরিকার আঁকা ছবি দেখে নায়ক উদয়নের উক্তি। শ্রীহর্ষ, রত্নাবলী, ২য় অঙ্ক।

২৩. "কিন্তু তিনি বাক্ ও বাচিকের ভেদটি কি তার উপর বিশেষ জোর দিয়ে অভিনয়ের স্বরূপ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণটি করেছেন তা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ।"—অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য, পৃঃ ৬২।

২৪. "যথা নৃত্তে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতাঃ"।—চিত্রসূত্র, ৩৫।৫। এখানে 'অনুকৃতি' বা অনুকরণ যে গৌণ অর্থে প্রযুক্ত তার প্রমাণ তার পরেই বলা হয়েছে "নৃত্তং চিত্রং পরং মতম্" (ঐ, ৩৫।৭)। নৃত্তে/নৃত্যে কখনোই অনুকরণ মুখ্য হতে পারে না। শ্রীকুমারের 'শিল্পরত্ন' গ্রন্থে —"স্বভাবত স্তেষাং করণং" (৪৬।২), "উচিতাকার" (৪৬।১২) আছে, কিন্তু অনুকরণ শব্দ নেই।

২৫. শিল্পকথা, পৃঃ ৩৬।